HAND-BOOK

OF

ENGALI LITERATURE

COMPILED

BY

AHENDRANATH BHATTACHARJYA. M. A. B. L.

FIFTH EDITION.

বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. এল.

সঙ্কলিত।

পঞ্চমাঙ্কন।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

বীণাযন্ত্র।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৯

ফলতঃ এই সমস্ত বহুদূরস্থিত জাতির ভাষায় কতক-গুলি এরূপ সুসদৃশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা এককালে একভাষী ও একজাতি ছিল, এই অনুমান আপনা হইতেই মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। যে মূল জাতি হইতে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আসিয়াখণ্ডের লোকে ইউরোপখণ্ডে গিয়া অধি-বাস করে, এরূপ একটী জনপ্রবাদ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং গ্রীক ও রোমক ইতিহাসবেত্তারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে লোকপুঞ্জ আসিয়া গ্রীস ও ইতালি দেশে অধিবাস করে। হিন্দুদিগের বেদসংহিতাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রপাঠে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা উত্তরাঞ্চলস্থ কোন শীতপ্রধান দেশ হইতে আগমন করিয়া সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করেন, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে বিকীর্ণ হন। পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যেখানে তাঁহাদের আদিম নিবাস ছিল, তথায় বৎসরের মধ্যে দশ মাস শীত, দুই মাস গ্রীষ্ম। অতএব বলিতে হইবে, তাঁহারাও হিন্দুদিগের

ন্থায় কোন হিমপ্রধান উত্তরদেশ হইতে আসিয়া পারস্থানে অধিবাস করেন। এই সকল কারণে, আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থল আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম নিবাস বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, আর্য্যগণ প্রথমতঃ কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশ সন্নিহিত তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য-প্রদেশে অধিবাস করিতেন। অনন্তর তথা হইতে বিনির্গত হইয়া নানা স্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি আদিম আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে গমন করিয়া আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমভাগ ও ইউরোপখণ্ডের বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড সমুদায় অধিকার করেন, আর কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আগমনপূর্ব্বক পারস্থান ও ভারতভূমি জয় করিয়া তথায় অধিবাস করেন।

কোন্ সময়ে যে ইদানীন্তন ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করেন, আর কোন্ সময়েই বা পারস্থানীয় ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ আদিম আবাস পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমনপূর্ব্বক পারস্থানে ও হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা

হউক, আর্য্যবংশীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা পারসীকদের সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অপেক্ষাকৃত অধিক দিন পর্য্যন্ত একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রীক ও রোমকদিগের প্রস্থানানন্তর হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বতন পুরুষেরা কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত একত্র অবস্থিতি করেন; পরে ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ সমুপস্থিত হয় এবং সেই বিসম্বাদ নিবন্ধন তাঁহারা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। এই বিরোধপ্রভাবে এক পক্ষ পারস্থানে প্রস্থান করিয়া পারসীক নাম প্রাপ্ত হন এবং অন্য পক্ষীয়েরা ভারতভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় উপনিবিষ্ট হইয়া, উত্তরকালে হিন্দু নামে বিখ্যাত হন।*

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে বোধ হয়, যৎকালে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন, তখন পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী সরস্বতী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত

*হিন্দু শব্দটী সংস্কৃত নহে; এটী প্রাচীন পারসিক ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও সিন্ধুর প্রাচীন পারসিক নাম হপ্তহেন্দু ও হেন্দু। এই নিমিত্ত বোধ হয়, সিন্ধু হইতে হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

হইয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইত। কিন্তু মনুসংহিতা বিরচিত হইবার পূর্ব্বেই কোন নৈসর্গিক কারণবশতঃ উহার গতির পরিবর্ত্তন হয় এবং পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী মরুভূমির অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, ক্রমশঃ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। যদি উত্তরকালে ভারতবর্ষীয় ভূদর্শনের সবিশেষ সমালোচনা হইলে সরস্বতী নদীর তিরোভাবের সময় নিরূপিত হয়, তাহা হইলে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কোন্ সময়েই বা বেদভাষা সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাও অবধারিত হইতে পারিবে।

এক আদিম আর্য্যজাতি হইতে যেরূপ গ্রীক, লাটিন্, জর্ম্মেন্, ইংরাজ, রুষ, পারসিক, হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ এক আদিম আর্য্যভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়াছে। আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম আর্য্যভাষার পরিণামে গ্রীক, লাটিন, পারসিক, বৈদিক প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার, এই শেষোক্ত ভাষাগুলির পরিণামে ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডের প্রায় যাবতীয় ইদানীন্তন প্রধান প্রধান ভাষা সমুৎপন্ন হই-

য়াছে। সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মনুষ্য-দিগের ভাষারও নিয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশবিশেষে রীতিবিশেষে রূপান্তরিত হওয়াতে কাল-সহকারে এক ভাষা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আদিম বেদ ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া মনু ও বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয় এবং কালসহকারে সেই সংস্কৃত ভাষার পরিণামে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধদেবের সময় গাথা নামে যে ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মগধদেশপ্রচলিত এক প্রকার প্রাকৃত বই আর কিছুই নহে। অশোক রাজার রাজত্বকালে ঐ গাথা নাম্নী ভাষা পালী নামে প্রখ্যাত হয়। পালী ভাষায় বৌদ্ধ-দিগের ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে অদ্যাপি উহার আলোচনা হইয়া থাকে। যৎকালে কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনী-রাজের সভায় থাকিয়া নিরুপম কাব্যনিচয় রচনা দ্বারা নির্ম্মল যশোরাশি লাভ করেন, তখন ভারতবর্ষে মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি অন্যূন দ্বাদশটী প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত প্রাকৃত ভাষার পরি-ণামে পঞ্জাবী, হিন্দী, মৈথিলী, বাঙ্গালা, উৎকল,

তৈলঙ্গী, কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রীয়, গুর্জ্জর প্রভৃতি ভারতবর্ষ-প্রচলিত অধুনাতন ভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, একই প্রাকৃত ভাষার পরিণামে হিন্দী ও বাঙ্গালার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিকও হিন্দীর সহিত সর্ব্বপ্রাচীন বাঙ্গালা রচনাবলীর যেরূপ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাতে এ অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কোন্ সময়ে আর্য্যেরা বঙ্গদেশে আসিয়া অধিবাস করেন, আর কোন্ সময়েই যে বঙ্গবাসী আর্য্যগণ বঙ্গভাষী বলিয়া বিখ্যাত হন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সিন্ধুনদের অপর পার হইতে আগমনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, সদানীরা সন্নিহিত প্রদেশ সকল জয় করিয়া অবশেষে সাগরসমীপবর্ত্তী বঙ্গদেশে প্রবেশ ও উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ফলতঃ পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলস্থ প্রদেশ সকল তাঁহাদের হস্তগত হইলেও এ প্রদেশে অনার্য্যদিগের প্রতাপ যে বহুকাল পর্য্যন্ত অখণ্ড ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে যে এতদ্দেশীয় কোন কোন অনার্য্য ভূপতি সূর্য্য কি চন্দ্রবংশীয় কোন কোন বীর্য্যবান্ নরপতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরাজিত হইয়া,

করদান পূর্ব্বক তদীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। পরন্তু বৌদ্ধমতাবলম্বী মগধদেশীয় মহীপতিদিগের পূর্ব্বে এ প্রদেশ যে আর্য্যদিগের সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হইয়াছিল, ইহা আমাদিগের বোধ হয় না।

পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, বঙ্গদেশ বহুকাল পর্য্যন্ত মগধদেশীয় মহীপতিদিগের অধীন ছিল। আমাদিগের বোধ হয়, তাঁহাদিগেরই অধিকার কালে মগধদেশবাসী আর্য্যেরা এ প্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। অনার্য্য সন্তানেরা নবাগত আর্য্যদিগের শৌর্য্য ও বীর্য্যবল সহ্য করিতে না পারিয়া দাসত্ব স্বীকার অথবা গহন ও গিরি-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করেন। অনার্য্য সহবাসে আর্য্যদিগের বিশুদ্ধ মাগধী ভাষাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া কালসহকারে এক প্রকার 'না হিন্দী না বাঙ্গালা' ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন পালবংশীয়দের সময়ে বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানেরা মগধাধিপতিদিগের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাব অবলম্বন করেন, বোধ হয়, তখন এতদ্দেশে ঐ 'না হিন্দী না বাঙ্গালা' ভাষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশীয় মহীপালগণ যৎকালে গৌড়ের রাজসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তৎকালে এতদ্দেশে

যে 'না হিন্দী না বাঙ্গালা' ভাষা প্রচলিত ছিল, বোধ হয় তাহার সহিত বিশুদ্ধ মাগধী বা পালী ভাষার বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না। অধুনাতন বঙ্গভাষার সহিত আসামদেশীয় ভাষার যেরূপ প্রভেদ, তৎকাল প্রচলিত এতদ্দেশীয় ভাষাব সহিত বোধ হয় মাগধী বা পালী ভাষার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ ছিল না। অধুনা আসাম দেশে যেরূপ অনেক স্থলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় না হইয়া ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় হইয়া থাকে, বোধ হয় পালবংশীয়দিগের রাজত্ব কালে তদ্রূপ ধর্ম্মকার্য্য, রাজকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য এতদ্দেশপ্রচলিত ভাষায় না হইয়া সংস্কৃত ও বৌদ্ধদিগের পরমপবিত্র পালী ভাষাতেই সম্পন্ন হইত।

এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, বিশুদ্ধ মাগধী ভাষার সহিত এতদ্দেশপ্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার বিভিন্নতা ক্রমশঃ অধিক হইয়া আইসে এবং অবশেষে যখন বেদনিরত ব্রহ্মপরায়ণ মহাবল-পরাক্রান্ত সেনবংশীয় নরপতিগণ বেদবিদ্বেষী পালবংশীয় ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া এ প্রদেশে একাধিপত্য করেন, তখন উহা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে পরিণত হয়। পরন্তু উক্ত বংশ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে যে,

বঙ্গভাষার অবয়ব রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল, ইহা আমাদের বোধ হয় না। কেননা তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যোৎসাহী চক্রবর্ত্তী নরপতিদিগের উৎসাহে যে, দেশীয় ভাষায় কোন না কোন অপূর্ব্ব গ্রন্থ বিরচিত হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভাষায় কোন গ্রন্থাদি প্রণীত হওয়া দূরে থাকুক্, তৎকালবিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থেও বঙ্গভাষার নামোল্লেখ নাই। ইহাতেই এক প্রকার সপ্রমাণ হইতেছে যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয় নাই। বঙ্গভাষার অঙ্গরচনাতেই এ বিষয়ের সবিশেষ নিদর্শন রহিয়াছে। এদিকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুদিন পূর্ব্বে যে, বঙ্গভাষার অঙ্গসংস্থান সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, "বিহারজেতা যবন রাজার দূত" বখ্তিয়ার খিলিজির আগমন-সংবাদ শ্রবণে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভন্নগরে জন্মগ্রহণ, এই দুই ঘটনার মধ্যে যে দুই শত অশীতি বৎসর অতীত হয়, তাহারই মধ্য ভাগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল।

পদকর্ত্তাদিগের বিষয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস।

কোন্ ভাগ্যবান্ জনের লেখনী হইতে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব প্রথম রচনা বিনির্গত হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, লাউসেনকৃত মনসার গান বঙ্গভাষার আদি রচনা। সমুদয় বঙ্গদেশে এক সময়ে মনসা দেবীর উপাসনার বহুল প্রচার ছিল এবং তাঁহার উদ্দেশে বঙ্গভাষায় পদ্যময় স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। সে যাহা হউক, বিদ্যাপতি-বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা প্রাচীন রচনা এ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত, ইহাঁরেই আমরা বঙ্গকবিকুলের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া মিথিলাধিপতি শ্রীশিব সিংহের রাজধানীতে থাকিয়া মৈথিলী ভাষায় হরপার্ব্বতী এবং রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক নানাবিধ সুমধুর পদাবলী রচনা করেন। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে কেবল রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পদাবলী বঙ্গদেশের আসিয়া অনেকাংশে বাঙ্গালা ভাব ধারণ করি-

য়াছে। নিম্নে বিদ্যাপতিকৃত কয়েকটী পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা গেল ;—

> "সবহুঁ মাতঙ্গ যো নহি মতি মানি।
> সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥
> সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত।
> সকল পুরুখ নারি নহে গুণবন্ত॥"

বিদ্যাপতির সমকালেই চণ্ডিদাস নামে আর এক জন কবি শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলিবিলাস বিষয়ক বহুতর পদাবলী রচনা করেন। তিনি ইদানীন্তন বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি ছাতনা গ্রামনিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রথমে অতিশয় মূর্খ ছিলেন এবং দিবানিশি কেবল তামাক সেবন করিতেন। এক দিবস রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া তামাক খাবেন মনে করিলেন, কিন্তু কোথাও অগ্নি না পাইয়া যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্নির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন মাঠের মধ্যে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী "বাশুলি" অর্থাৎ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন তিনি অগ্নিলাভের প্রত্যাশায় দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি

যাহা অগ্নি মনে করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা অগ্নি নহে, দেবীর অঙ্গজ্যোতিঃ অগ্নিরূপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তখন তিনি ভীতিসমন্বিত ভক্তি-রসাভিষিক্ত হৃদয়ে দেবীরে প্রণাম করিলেন, দেবীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি দুর্ল্লভ কবিশক্তি প্রদান করিলাম, তুমি আমার প্রভুর ব্রজলীলা বর্ণন কর।" চণ্ডীদাস এইরূপে কবিশক্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব পূর্ব্বে চণ্ডীদাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনুক্ত বচন পাঠে প্রতীতি হইবে, চৈতন্যদেব, বিদ্যা-পতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই কৃত পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥"

নিম্নে চণ্ডীদাসকৃত দুইটী পদ প্রকটিত করা গেল।

এ পাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠল হিয়ায়॥

শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এদেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরুলতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিনু মুঞি এ গরল বিষে॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এ ছাব রসনা মোরে হৈল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
ততই দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
শ্যাম কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক রাহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু করে অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥
কাহারে কহিব দুঃখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরম কহি সে বাসয়ে পর॥

আপনা বলিতে বুঝিনু সে নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিলাম ভাবিয়া অন্তরে ॥
মনের মরম কহি যুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে ॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এতিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া ॥
এদেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর রায়শেখর, বাসু-ঘোষ, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি তদীয় ভক্তগণ বিস্তর পদাবলী রচনা করেন। এস্থলে জ্ঞানদাস বিরচিত একটী পদ প্রকটিত করা গেল।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥
সখি রে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বরজ তাপে।
জ্ঞানদাস কহে কিসের লাগিয়া পাছে কর অনুতাপে ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি সহ-

কারে বঙ্গভাষারও যে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। উল্লিখিত পদাবলী ব্যতীত তাঁহার শিষ্য ও অনুশিষ্যগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে রূপগোস্বামিকৃত রিপুদমন বিষয়ের রাগময়কোণ, সনাতনগোস্বামি-প্রণীত রসময় কলিকা, জীবগোস্বামি-রচিত কড়চাই, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ। নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণন বিষয়ক কয়েকটী পংক্তি সমুদ্ধৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নবদ্বীপ অবতরী।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস॥
নিরন্তর কৈলা তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন॥
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥

অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃত ভাসাল সকলে॥

কৃত্তিবাস।

এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মাগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই রসভাব সমন্বিত সুবিস্তৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া যান নাই। অনন্তর আকবর সাহের রাজত্বকালে শান্তিপুর সন্নিহিত ফুলিয়া গ্রামনিবাসী বিপ্রবংশসম্ভূত কবিবর কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের ভাষা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সেই অভাব বিমোচন করেন। ফলতঃ কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রাচীন মহাকাব্য। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ যে অন্যান্য মহাকাব্য অপেক্ষা প্রাচীন, উহার রচনা প্রণালীতেই তাহা অনুসূচিত রহিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের ন্যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণও সরলতারূপ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত। বস্তুতঃ ভাষা রামায়ণের রচনা অতি সরল, উহাতে জটিলতার লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত; আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড।

"আদিকাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে মিত্র সুগ্রীব মিলন॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ॥
এই সুধাভাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন॥"

১৮০২ খৃঃ অব্দে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু উহা এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা বটতলার পুস্তক বিক্রেতাগণ যে রামায়ণ কৃত্তিবাসের বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত।

কবিকঙ্কণ।

কবিবর কৃত্তিবাসের জীবদ্দশাতেই অথবা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 'কবিতাপঙ্কজরবি শ্রীকবিকঙ্কণ' কাব্যাকাশে সমুদিত হইয়া স্বীয় নির্ম্মল

কবিত্ব-প্রভায় গৌড়দেশ প্রভাময় করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রাম। চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র ও পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। হৃদয়-মিশ্রের দুই পুত্র, কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ। দাতা-কর্ণ প্রবন্ধে যে কবিচন্দ্রের নামে ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই কবিকঙ্কণের অগ্রজ বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। বোধ হয়, কবিকঙ্কণের ন্যায় কবিচন্দ্র নামটীও উপাধিমাত্র। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। চক্রবর্ত্তী কবিবরের পিতৃ পিতামহের মিশ্র উপাধি দেখিয়া বোধ হয়, প্রথমে তাঁহাদের মিশ্র উপাধি ছিল, পরে এতদ্দেশে বাস করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত হন।

চণ্ডীকাব্য মধ্যে গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তৎপাঠে অবগতি হয় যে, বর্দ্ধমান বিভাগের শাসনকর্ত্তা দুরাত্মা মামুদ সরিফের দৌরাত্ম্য নিবন্ধন মুকুন্দরামকে পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে জন্মভুমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে, পলায়ন কালে পথিমধ্যে এক দিবস এক সরোবর তীরে তিনি রুক্ষস্নান ও উদক মাত্র পান

করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে শঙ্কর-মোহিনী চণ্ডী স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গের পরেই তিনি পত্র ও মসী লইয়া কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অনন্তর নানা স্থানে পর্য্যটন ও অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে আড়রাগ্রাম নিবাসী রাজা রঘুনাথের সন্নিধানে উপনীত হইয়া আত্মবিবরণ বর্ণনানন্তর স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা কবিতা শ্রবণে যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়া পুরস্কার স্বরূপে রচয়িতাকে দশ আড়া ধান্য প্রদান করিলেন এবং স্বীয় পুত্রের শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। রাজা রঘুনাথ তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহারই প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন।

চণ্ডীকাব্যে মুকুন্দরাম অসামান্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রচনা-পারিপাট্য বিষয়ে কেহ কেহ মুকুন্দরাম অপেক্ষা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বগুণে গৌড়ীয় কোন কবিই চণ্ডীকাব্যকার হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। তাঁহার কীদৃশ কবিত্ব শক্তি ছিল, তাহা

সহজে বর্ণনা করা যায় না। যে সকল সৌভাগ্য-শালী মহাত্মাগণ কাব্যরসাস্বাদনে সম্যক্ সমর্থ, তাঁহা-রাই বলিতে পারেন কবিকঙ্কণের কেমন অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি ছিল। ফলতঃ তাঁহার সদৃশ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবি বঙ্গদেশে আর কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ব্যাধনন্দন ও সওদাগরের উপাখ্যান তাঁহারই মানস সম্ভূত; তাঁহার পূর্ব্বে কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন কবিই কালকেতু এবং ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপা-খ্যানের অনুরূপ কিছুই বর্ণনা করেন নাই। কালী-দহে কমলবাসিনী কামিনী কর্ত্তৃক করিগ্রাস ও উদ্গী-রণ ব্যাপার বর্ণন করিয়া চক্রবর্ত্তী কবিকল্পনার এক-শেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণ এক সময়ে অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, বোধ হয় এজন্যই দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ফুল্লরার বার মাস বর্ণন, খুল্লনার ছাগচারণ, ধনপতির কারামোচন কালের আক্ষে-পোক্তি প্রভৃতি বিষয় গুলি পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। স্বভাব বর্ণন ও সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণন বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। বলিতে কি, সমাজসংক্রান্ত রীতি নীতি বর্ণনায় তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার

অনুরূপ অন্য কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। তৎ-প্রণীত আদিরস ঘটিত বিষয় গুলিও অতি চমৎকার ও মনোহর এবং অশ্লীল শব্দ শূন্য হওয়াতে অতিশয় প্রশংসনীয়।

কাশীরাম দাস।

কবিকঙ্কণের পর কাশীরাম দাস, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ বিরচিত অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের ভাষা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ভারতামৃতপানাভিলাষী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গবাসিগণের মহোপকার করেন। তিনি কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অধুনা তাহার নিশ্চয় করা সুকঠিন। স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় কাশীরাম দাস ভাগীরথী তীরস্থিত ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের চারি পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, দেবরাজ মধ্যম, কাশীরাম তৃতীয় ও গদাধর কনিষ্ঠ।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গতা ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
মস্তকে ধরিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
বিরচিলা কাশীদাস দেবরাজানুজ॥
"কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।"

কাশীদাসকৃত মহাভারত সংস্কৃত মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে। মূলের সহিত ভাষা মহাভারতের অনেক স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, পুরাণবক্তাদিগের নিকট সংস্কৃত মহাভারতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাষা মহাভারত রচনা করেন। বিরাট পর্ব্বে এক স্থলে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন।

"মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
ভেলা বান্ধি চাহি যেন সমুদ্র তরিবারে॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার॥"

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাশীরাম দাস আদি,

সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কিয়দ্দূর মাত্র লিখিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

“আদি সভা বন বিরাট কত দূর।
লিখি কাশীদাস চলি গেলা স্বর্গপুর॥”

কিন্তু এই জনপ্রবাদ কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

রামায়ণ ও চণ্ডীর অপেক্ষা মহাভারতের রচনা প্রণালী যে উৎকৃষ্ট, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ফলতঃ মহাভারতের রচনা যেরূপ সরল প্রাঞ্জল তেমনি প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। কাশীরাম দাস কবিত্ব-গুণে কবিকঙ্কণের তুল্য ছিলেন না বটে, কিন্তু যে মহাত্মা সুললিত ভাষায় ও নানাবিধ সুমধুর ছন্দে অমৃতসমান মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তিনি যে অসামান্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

সুপ্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে, আনুমানিক ১৬৪৪ বা ১৬৪৫ শকে কবিরঞ্জন রাম-প্রসাদের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রাম রাম সেন ছিল। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কলিকাতাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রভু অতিশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের কবিত্বগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবিতা রচনা ও ঈশ্বর আরাধনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের অধিপতি সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মধ্যে মধ্যে বায়ুসেবনার্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনি রামপ্রসাদের শক্তি পরায়ণতা ও কবিত্ব গুণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া "কবিরঞ্জন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক রাজারে সমর্পণ করেন। মহারাজ রাম প্রসাদকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীত শ্রবণে ও তাঁহার সহিত সদালাপে কালহরণ করিতেন। তৎকালে কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, সকলে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কিন্তু কবিতারচনায় তাঁহার যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহাতে তাঁহাকে পাগল বলিতে ইচ্ছা হয় না। কথিত আছে, রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই আজুগোসাই তাহার একটী উত্তর দিতেন। কৌতুকপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয়ের বিবাদ দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

কবিরঞ্জনের স্বর তাদৃশ সুমধুর ছিল না, পরন্তু স্বরচিত পদাবলী গানে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে দেবদ্বেষী দুরাত্মা নবাব সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃকরণও দ্রবীভূত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বামাচারী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপানও করিতেন। অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা করিত, কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন না। তাঁহার অদ্ভুত কবিশক্তি ও অসাধারণ শক্তি ভক্তি দেখিয়া

অনেকে তাঁহাকে দেবীর বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা কালী পূজার বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরধূনী তীরে গমন করেন এবং এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কালীবিষয়ক পদ গান করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন নামধেয় একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। তদ্ব্যতীত তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে অপর দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিস্তর পদাবলী রচনা করিয়া যান। অনেকে বলেন তিনি এক লক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থখানি এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কালীকীর্ত্তনের রচনা অতিশয় মধুর এবং উৎকৃষ্ট ভাব সমূহে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্জনপ্রণীত বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রধান কাব্য। ইহাতে তোটক প্রভৃতি নানাবিধ নূতন ছন্দ সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার রচনা স্থানে স্থানে কর্কশ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়। এই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরকেই আদর্শ

করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরস্থট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়াগ্রামে ১৬৩৪ শকে কবিবর ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন। নরেন্দ্র নারায়ণের চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ভারত সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিয়া তাজপুর গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্যাকরণ অভিধানাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। পরন্তু ভ্রাতৃগণের সহিত অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং হুগলির সন্নিহিত দেবানন্দপুর নাম গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের আশ্রয়ে অবস্থান করত পারসী পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি দুই খানি

সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনা করেন। কথিত আছে, মুন্সী মহাশয়ের বাটিতে এক দিবস সত্যনারায়ণের কথার সময়ে সকলে তাঁহাকে পাঠকতা করিতে বলেন। ভারতচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া অমনি তখনি স্বয়ং এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং উপস্থিত সভায় সেই খানি পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। এতাদৃশ অল্প বয়সে ঈদৃশ রচনা সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নহে। ফলতঃ উত্তর কালে তিনি যে অত্যুন্নত পদে অধিরোহণ করিবেন ঐ দিবসেই তাহার প্রথম নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সত্যনারায়ণের কথা হইতে কবির পরিচয়সূচক কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।

ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হতকংশ, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটীখ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রাম চন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥

অনন্তর বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পারসীতে কৃতবিদ্য হইয়া পিত্রালয়ে প্রতিগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্দ্ধমানের রাজ দরবারে স্বীয় বিষয় সম্বন্ধে মোক্তারি করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তথাকার রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হইলেন। পরে রক্ষিদিগের কৃপায় নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া কটকে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন ছিল। ভারতচন্দ্র, শিবভট্ট নামা তত্রত্য দয়াশীল সুবাদারের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাস করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে সুবাদার সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ভারতচন্দ্র তদীয় অনুগ্রহে পরমসুখে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৈষ্ণবগণ সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া আপনিও একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জনৈক আত্মীয়ের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন শারদাগ্রামে স্বীয় শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া বিষয়কর্ম্মের অন্বেষণে

বহির্গত হইয়া ফরাসীগবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে তাঁহাকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজাও আগ্রহাতিশয় সহকারে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে আপনার সভাসদ করিলেন। ভারতচন্দ্র সুললিত কবিতা সকল রচনা করিয়া রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁহাকে গুণাকর উপাধি দিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ একখানি অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে বিখ্যাত অন্নদামঙ্গল মহাকাব্যের সৃষ্টি হইল। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিরচিত বিদ্যাসুন্দর প্রাপ্ত হইয়া ভারতচন্দ্রকে তদনুরূপ আর একখানি কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বর্দ্ধমানের রাজপরিবারের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল এবং ভারতচন্দ্রের হৃদয়েও বর্দ্ধমানের কারাবাসাদি ক্লেশজনিত দারুণ রোষানল প্রজ্বলিত ছিল। সুতরাং তিনি মহোল্লাস সহকারে বর্দ্ধমান রাজবংশের গ্লানিসূচক ইতিহাস লইয়া বিদ্যা-

সুন্দর মহাকাব্য রচনা করিয়া কৌশলক্রমে উহা অন্নদামঙ্গলের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তৎপরে মানসিংহ, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। অনন্তর মহারাজ মূলাজোড় গ্রামে তাঁহার নিমিত্ত যে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তথায় জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়া ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন।

অনেকেই বলেন ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষার প্রধান কবি। কিন্তু যাঁহারা কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা কখনই স্বীকার করিবেন না। ভারতচন্দ্রের যেরূপ রচনাশক্তি ছিল, আক্ষেপের বিষয়, তাদৃশ কল্পনাশক্তি ছিল না। তিনি চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যের প্রারম্ভে গণেশাদি দেবতাদিগের বন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতির জন্ম ও বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট নায়ক নায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, শব্দশ্লেষ সহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয় প্রদান ইত্যাদি বিষয় সকল চণ্ডীকাব্যের অনুকরণমাত্র তাহার সন্দেহ

নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যও তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরকে আদর্শ করিয়া তিনি স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রণয়ন করেন। কথিত আছে বররুচি সংস্কৃত ভাষায় একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া যান। সংস্কৃত ভাষায় বররুচি বিরচিত বিদ্যাসুন্দর নামে একখানি কাব্য আছে, কিন্তু বররুচি তাহার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কি না তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। সুপ্রসিদ্ধ চোরপঞ্চাশৎ নামক ৫০ শ্লোকও চোরবিহ্লন নামক একজন প্রাচীন কবির বিরচিত। মালিনীর বেসাতির হিসাব, সুপুরুষ দর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, মশানে পিশাচ-সেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট রাজকন্যার বারমাস বর্ণন, ঝড় বৃষ্টি দ্বারা দেশ বিপ্লাবন ইত্যাদি বিষয়গুলি যে চণ্ডীকাব্য দৃষ্টে বির-চিত হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুলেখক বঙ্গভূমিতে আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচনা যেরূপ সরল, মধুর ও ললিত সেরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না। তৎপ্রণীত সুললিত ভাষাগীত শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে। আদিরস বর্ণনায়

তিনি অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্থানে স্থানে এরূপ অশ্লীল হইয়াছে যে বিরলে বসিয়া পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। বিরাম ও মিত্রাক্ষর বিষয়েও তাঁহার কবিতাবলী অন্যান্য কাব্যনিচয় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, কবিত্ব, ছন্দোবন্ধ মিত্রাক্ষর ও প্রসাদ গুণের একত্র সমাবেশ বশতঃ যার পর নাই মনোহর।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে আনুমানিক ১২২২ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পঠদ্দশাতেই বঙ্গভাষায় বাসবদত্তা ও রসতরঙ্গিনী নামে দুই খানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় মাসিক ১৫ টাকা মাত্র বেতনে একটী

পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে ২৫ টাকা বেতনে বারাসত ট্রেবরস্কুলের প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের দেশীয় ভাষার অধ্যাপকের আসন প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস সিবিলিয়ান্‌গণকে শিক্ষা প্রদান করেন। পরে কৃষ্ণনগরে কালেজ সংস্থাপিত হইলে তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতের পদে সমাসীন হন। কিয়দ্দিন পরে তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইলেন। সেই সময়ে তিনি বঙ্গভাষার বালকদিগের প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া ক্রমান্বয়ে তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রচার করেন। অনন্তর ১২৫৬ সালে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে তিনি জেলা মুর্শীদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া বহরমপুর গমন করেন। এবং অবশেষে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত জেলার অন্তঃপাতী জেমুয়াকান্দী নামক স্থানে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রযত্নে এই অঞ্চলে নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে কান্দী হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত যে একটী প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হয় তাহা অদ্যাপি "মদনতর্কালঙ্কারের শড়ক" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

১২৬৪ সালের ফাল্গুন মাসের সপ্তবিংশ দিবসে তর্কালঙ্কার পরলোক গমন করেন।

মদনমোহন সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে রসতরঙ্গিণী ও একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাসবদত্তা প্রণয়ন করেন। রসতরঙ্গিণী কতকগুলি আদিরস ঘটিত সংস্কৃত উদ্ভটকবিতার ভাষা অনুবাদ মাত্র। ইহার রচনা ললিত ও মধুর এবং এমন কি, স্থানে স্থানে মূল হইতেও বোধ হয় উৎকৃষ্ট; কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলি যার পর নাই অশ্লীল। বাসবদত্তার আখ্যায়িকাটী কবির স্বকপোলকল্পিত নহে; ভুবনবিশ্রুত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নময়ী সভার অন্যতম রত্ন বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু সংস্কৃত ভাষায় বাসবদত্তা নামে যে সুললিত কাব্য রচনা করেন, তর্কালঙ্কার কবি তদীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত ভাষা কাব্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী অতি চমৎকার ও অনুপ্রাসচ্ছটা যার পর নাই মনোহর, এবং বাঙ্গালা কাব্যনিচয়ের মধ্যে কেবল মদনমোহন কৃত এই বাসবদত্তা কাব্য দ্রুতগতি, গজগতি, পজ্ঝটিকা, অনুষ্টুপ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দোময়ী কবিতাবলীতে বিভূষিত। পরন্তু ইহার যেরূপ কয়েকটী বিশেষ গুণ আছে তদ্রূপ কয়েকটী বিশেষ দোষও

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচনা যেরূপ মধুর ; সকল স্থলে ভাব সেরূপ প্রগাঢ় নহে এবং ইহাতে অনুপ্রাসাদির যেরূপ বাহুল্য লক্ষিত হয় তদনুরূপ প্রসাদগুণ দৃষ্ট হয় না। আবার আদিরসবিষয়ক বর্ণনাগুলি ভূরি ভূরি স্থলে সাতিশয় অশ্লীল। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত কাব্য জনসমাজে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই। কবি স্বয়ংও এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ফলতঃ তিনি পূর্ণবয়সে যৌবনকালবিরচিত এই উভয় গ্রন্থের উপর যার পর নাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত শিশুশিক্ষা তিন খানি অতিশয় প্রশংসনীয়। প্রথম ভাগের শেষে "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল," ইত্যাদি প্রভাত বর্ণন বিষয়ক যে কয়েকটী কবিতা আছে তাহার তুল্য প্রসাদগুণ সমলঙ্কৃত কবিতা বঙ্গভাষায় অতি বিরল। ফলতঃ তর্কালঙ্কারের অসামান্য রচনাশক্তি ছিল একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে জয়দেব যেরূপ আশ্চর্য্য রচনানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গভাষায় মদনমোহন স্থলে স্থলে প্রায় তদ্রূপ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যেরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুরূপ কিছুই লিখিয়া যান নাই।

প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতার ১৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতীরে কাঁচড়াপাড়া নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় ১২১৬ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তিনি কখন কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু অতি শৈশবকাল হইতেই কবিতারচনা বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মানস সরোবরে সেই কমনীয় কবিতা কমল বিকসিত হয়, যাহার সুধাময় সুমধুর সৌরভে দিগন্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি আমোদিত রহিয়াছে। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মৃত মহাত্মা যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ও আনুকূল্যে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ প্রভাকর পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকর পত্রের সহিত তাঁহার নাম এরূপ সুসম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, ইহার নামোচ্চারণ মাত্রই তাঁহার নাম এবং তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রই ইহার নাম স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। যেরূপ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নামের পরিবর্ত্তে কবিকঙ্কণ নামটী সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নামের পরিবর্ত্তেও অনেকে সেইরূপ প্রভাকর আখ্যাটী ব্যবহার

করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর গুপ্ত ও প্রভাকর এই দুই নামেই তিনি সমান প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে "প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

প্রভাকরের কলেবর সংবাদ ও বিজ্ঞাপন দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং সম্পাদয়িতার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিবার সেরূপ সুবিধা হইত না। এই নিমিত্ত তিনি এক খানি মাসিক প্রভাকর প্রচারণে প্রবৃত্ত হন। এতদ্ব্যতীত সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে দুই খানি সাপ্তাহিক পত্রও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। সাধুরঞ্জন সাধুদিগের চিত্তরঞ্জনোপযোগী বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বিভূষিত থাকিত এবং পাষণ্ডপীড়নে পাষণ্ডগণের অঙ্কুশস্বরূপ নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ভাস্করসম্পাদক গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'রসরাজ' নামক পত্রের সহিত পাষণ্ডপীড়নের কিয়ৎকাল বিষম বিসংবাদ চলিয়াছিল। এমন কি সম্পাদকেরা প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যার পর নাই অশ্লীল বিষয় লিখিয়া স্ব স্ব পত্র দূষিত করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ এবং ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত এই

কয়খানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নিধু বাবু, হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস প্রভৃতি কবিগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া প্রভাকর পত্রে ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় প্রকাশ করেন। পরে ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তটী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। প্রবোধপ্রভাকর ও হিতপ্রভাকর এই উভয় গ্রন্থই গদ্য-পদ্যময় চম্পু কাব্য। প্রবোধপ্রভাকর আত্মতত্ত্ববিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ ও হিতপ্রভাকর বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত সংস্কৃত হিতোপদেশের আভাস লইয়া বিরচিত। হিত-প্রভাকরের ইতিবৃত্তটী অতিশয় কৌতূহলজনক; যে মহাত্মা দুস্তর সাগর পার হইতে এতদ্দেশে আসিয়া হিন্দুমহিলাদিগর দুরবস্থাসন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাহা-দিগের দুঃখ বিমোচন ও উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছিলেন ও তদুদ্দেশে অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে যাহাতে তাহা-দের অবিদ্যারূপতিমিরাচ্ছন্ন মানসাকাশে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় তাহার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন এবং এই মহানগরীস্থ হেদুয়া দীর্ঘিকার বায়ুকোণস্থিত বালিকাবিদ্যালয়ের পরম রমণীয় অট্টালিকাটী যাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে অদ্যাপি বিরা-

জিত রহিয়াছে, সেই বঙ্গীয় অবলাকুলহিতৈষী বেথুন সাহেব মহোদয়ের অনুরোধে এই কাব্যখানি প্রণীত হয়। ইহার রচনা সরল ও প্রাঞ্জল। বোধেন্দু বিকাশ সংস্কৃত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম্ম লইয়া রচিত, ইহার অধিকাংশই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। হাস্য-রস বর্ণনায় গুপ্ত মহাশয় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। ফলতঃ এ বিষয়ে তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শিবপুর গ্রামে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান। ইনি স্বপ্রণীত "পদ্মিনী" উপাখ্যান নামক কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন "কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক কাল সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।

বাঙ্গালা সমাচারপত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করি।” নায়ক নায়িকার প্রেম সংঘটনাদি ‘আদি-রসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে।’ এই বিবেচনায় রঙ্গলাল কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে ক্ষত্রিয়রমণীকুলশিরোমণি পতি-পরায়ণা পদ্মিনীর বিবরণ অবলম্বন পূর্ব্বক ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ নামক প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গ-ভাষায় কবিতা রচনা বিষয়ে এক নূতন প্রণালী প্রদ-র্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ‘কর্ম্মদেবী’ ও ‘শূরসুন্দরী’ নামে অপর দুই খানি কাব্য প্রণয়ন করি-য়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার কাব্যত্রয়ের মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই কাব্য-গুলির মধ্যে স্থলে স্থলে প্রকৃত কবিত্বের বিলক্ষণ পরি-চয় পাওয়া যায়। ফলতঃ রঙ্গলালের কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে; তাঁহার রচনা প্রণালী ও ছন্দো-বন্ধও মন্দ নয় এবং তৎপ্রণীত কাব্য সকল স্থানে স্থানে প্রগাঢ় ভাবসমূহে পরিপূর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে তিনি যে কবি ও সুপথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল সমা-দৃত হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুকুন্দরাম কৃত বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যের এক নূতন সংস্করণ প্রচার করেন। স্বপ্রচারিত গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি কবিকঙ্কণের কবিত্বাদি সংক্রান্ত যে সমালোচনটী সন্নিবেশিত করিয়া দেন তাহা অতি চমৎকার এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি এডুকেশন গেজেটের কিছু দিন সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষনদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবীদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা সদরদেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহাঁরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে

ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তথাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহাঁর পিতা ইহাঁকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্‌স্‌ কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশ প্রত্যাগত হন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন ;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা? ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার প্রথা ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তিলোত্তমা, মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা এই তিন খানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে

লিখিত। ইহাঁর রচনা-প্রণালী কি ছন্দোবন্ধের বিস্তারিতরূপে দোষগুণ বিচারের এ উপযুক্ত স্থল নহে। যাহা হউক ইনি যে, ইদানীন্তন বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

১২৮০ সালের ১৬ই আষাঢ়ে ইনি পরলোক গমন করেন।

সাহিত্য-সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

(কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত)

রামচন্দ্রের বনগমন।

রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন॥
যেই রাম ভ্রমেণ সোণার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে।

বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে রবে প্রাণ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র যার হৈল বনবাসী॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥
জানকী সহিতে রাম যান তপোবন।
রাজ্যসুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ॥
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে॥
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাও ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া॥
শৃগাল ভল্লুক হউক অযোধ্যানগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে॥
এইরূপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে॥
এক প্রকোষ্ঠ বাহিরে রহে তিন জন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন॥
ভূপতি বলেন যে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি॥
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যান বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥

প্রাণ যাক তাহে যেন নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক॥
জগতের হিত রাম জগত-জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন॥
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে ত্বরা যাই তিন জনে॥
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
তব সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর॥
যাত্রা কালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোন জন শুনিতে না পায় কার বোল॥
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে
বসন তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে রোদন করে সীতার কারণে।

সীতাহরণে রামের বিলাপ।

শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥

পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটী পালটী যত গোদাবরী তীর॥
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন॥
উপদেশ বাক্যে মন না দেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥

বুঝি কোন্ মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরী-নীরে আছে কমলকানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতাবে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন আমি যদি হইয়াছি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনক-লতার প্রায় জনকদুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে না ভাবে॥

সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিয়াছে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন শুন মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য! তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন॥

সীতার শোকেতে, মনের দুঃখেতে, মূর্চ্ছিত রঘুরায়।
কান্দিয়ে কাতর, নবজলধর, ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কটীর বাকল, খসিয়া পড়িল, শরীর ভাসিল জলে।
শিরের জটা, মেঘের ঘটা, লোটায়ে পড়িল ধূলে॥

হাতের ধনু, লোটায় তনু, অবশ হইল শোকে।
অধৈর্য্য হইয়ে, আকুল কান্দিয়ে, জানকী বলিয়ে ডাকে॥
কোথা চন্দ্রাননী, চম্পকবরণি, চন্দ্রনিন্দিত যাহার দে।
সোহাগে অতুলি, সোণার পুতলি, হিয়া হতে নিল কে॥
গুণেতে অসীমা, কাঞ্চনপ্রতিমা, কেশরী জিনিয়ে কটী।
ভুজঙ্গদলনী, বাহুর বলনি, রাতুল চরণ দুটী॥
কুরঙ্গনয়নী, মাতঙ্গগামিনী, ভুজঙ্গ জিনিয়ে কেশ।
সীতারে না হেরে, পরাণ বিদরে, মরণ ঘটিল শেষ॥
এ তাপ কে দিল, পরাণে বধিল, হরিল মৃগাঙ্কমুখী।
আর না হেরিব, কত না ঝরিব, মরিব গরল ভখি॥
ধিক্ মোর আঁখি, সীতা নাহি দেখি, আর কার মুখ দেখে।
ধিক্ রে জীবন, হারায়ে সে ধন, এ দেহ কেন বা থাকে॥
এত বলি রাম, দেখিয়ে পাষাণ, অঙ্গ আছাড়ে তাতে।
শিরে শিলাঘাত, করিতে নির্ঘাত, লক্ষ্মণ ধরেন হাতে॥
কাতর হেরিয়ে, কোলেতে করিয়ে, সুমিত্রা-তনয় কয়।
প্রভু!
সুবোধ হইয়া, অঙ্গনা লাগিয়া, এ ত করা উচিত নয়॥
সুত পরিবার, কেবা বল কার, যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্বপ্রায়, সকল মিছামায়, কেবল ভবের মায়া॥
প্রভু কন শুন, প্রাণের লক্ষ্মণ, রাজ্য ধন পিতা নাই।
তাতে নাহি খেদ, সীতার বিচ্ছেদ, পরাণে সহে না ভাই॥
জনক জননী, বান্ধব ভগিনী, যত পরিবার লোক।
সবার হইতে, পরাণ দহিতে, নারীর বড়ই শোক॥
কমঠ কঠোর, কঠিন দুষ্কর, সে ধনু ভাঙ্গিতে আমি।

যত দুঃখ পাই, সঙ্গে ছিলে ভাই, সকলি দেখিলে তুমি ॥
জনক সভাতে, মোর হাতে হাতে, সুপে দিল সুকুমারী।
ধনুক ভাঙ্গা ধন, নিল কোন জন, বুকেতে মারিয়ে ছুরি ॥
অযোধ্যাভবন, যাব না লক্ষ্মণ, এ মুখ দেখাব কায়।
জানকীর পিতে, জনক সুধাতে, কি বলিব বল তাঁয় ॥
যখন দাঁড়ায়ে, সম্মুখ হইয়ে, কহিবে এ সব কথা।
চোদ্দ বছর পরে, রাম এলি ঘরে, জানকী আমার কোথা।
এই কথা তিনি, সুধাইলে আমি, কি বলিব তাঁর ঠাঁই।
কি কথা কহিব, কেমনে বলিব, জানকী তোমার নাই ॥
আমার,
গিয়েছে সকল, পরেছি বাকল, ধরেছি কাঙ্গালীর বেশ।
এত দুঃখ পাই, প্রাণ ছিল ভাই, সীতা হতে হলো শেষ ॥
সীতা মোর মন, সীতা প্রাণ ধন, সীতা নয়নের তারা।
সীতা বিনা প্রাণ, বাঁচে না লক্ষ্মণ, যেন ফণি মণিহারা ॥
আমার হৃদয়, পিঞ্জর সম হয়, সীতা ছিল তাহে সারি।
বিহঙ্গী উড়িল, পরাণে মারিল, পিঞ্জর রহিল পড়ি ॥
দেশে দেশে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, কুণ্ডল পরিব কাণে।
নহে
ঘুচাইব তাপ, সাগরেতে ঝাঁপ, দিয়ে ত্যজি পোড়া প্রাণে
কি কব কাহারে, পরাণ বিদরে, হিয়ার মাঝার হতে।
কে নিল আমারি, জনক ঝিয়ারি, সোণার ভ্রমরী সীতে।

বালী কর্ত্তৃক শ্রীরামের ভর্ৎসনা।

ভূমে পড়ি বালী রাজা করে ছট্‌ফট্‌।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে ॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী।
দন্ত কড়মড়ি করে দেয় গালাগালি ॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে ॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে বাণ এ কোন বিধান ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে ॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনে বিনাশিলে মহাপ্রাণী ॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ ॥
তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিবে প্রাণ সদা ভাবে মনে ॥
সর্ব্বলোকে বলে রাম ধর্ম্ম অবতার।
ভাল রাম দেখাইলে সেই ব্যবহার ॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ ॥

কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যের হয় হানি ॥
সম্মুখা সম্মুখী যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥
সম্মুখ সমর বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর ॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ ॥
কেমনে দেখাবে মুখ বিশিষ্ট সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালীরাজে ॥
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার ॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ॥
ধর্ম্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে দুষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥
বানর হইতে কার্য্য করিতে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥

রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রি সহ করিলে মন্ত্রণা॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্ ছার॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবাইনু চারি পারাবারে॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে॥
ত্রিলোক বিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব॥
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতব।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আনিতাম রাবণের ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়॥
এ নহে বিচিত্র ভার আমি বালিরাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ॥
বিস্তর ভর্ৎসিল রামে রণস্থলে বালী।
কৃত্তিবাস বলে বালী কেন দেহ গালি॥

বালী বধে তারার উক্তি।

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তম কুলে।
আমার পতি কাটিলে তুমি পাইয়া কোন্ ছলে

দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ।
অদেখা মরিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণহৃদয়।
মুঞি শাপ দিব যেন হয়ত নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে।
সীতা ঘরে আসিবেন বহু পরিশ্রমে॥
সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ।
কত দিন রহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ॥
তুমি যেমন কাঁদাইলা বানরের নারী।
তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতাল পুরী।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের খেদ।

রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কাঁন্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী॥
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগর পারে বাম হইল বিধি॥

মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখী নিরন্তর।
কেনরে নিষ্ঠুর হৈলে না দেহ উত্তর ॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥
রাজ্য ধনে কার্য্য নাহি নাহি চাই সীতে।
তোমারে লইয়া আমি যাইব বনেতে ॥
উদয় অস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
অখ্যাতি মরণে তব রহিল আমার ॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে আইলে বনবাস ॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমিরে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান ॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিলাম ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালী ॥
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্যদণ্ড।
কৈকেয়ী বিধাতা তাহা হইল পাষণ্ড ॥

পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ।
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দহ রামচন্দ্র পাইবে লক্ষ্মণ॥
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস॥

মোহিনী বেশধারিণী চণ্ডীর নিকট কাল-কেতু ব্যাধের রমণী ফুল্লরার বার-মাসের দুঃখ বর্ণন।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনী॥
ভেরাণ্ডার খুঁটি আছে তার মধ্যে ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখ বসন্ত ঋতু খরতর খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন॥
বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকরে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥

পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খায়ে করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁকে, নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি নীরে॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়ায় আইসে বান॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥
কত নিবেদিব দুঃখ, কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা॥
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥

কেহ না আদরে মাংস, কেহ না আদরে ॥
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের চড় ॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি ॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন ॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটীয়া পাথরা।
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্ম ফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল ॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥

সদাগরের কমলে কামিনী দর্শন।

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগরয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজহংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশ নখে দশ চন্দ্র ভাষে।
কোকনদ অর্থ হরি, বেষ্টিত যার কবরী,
অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে॥
অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা,
তনু রুচি ভুবন মোহন॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষি,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

হেদেরে কাণ্ডারী ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষি॥

প্রামাণিক বলয়ে গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সঙ্গে তরঙ্গের ভার।
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধবিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কমলিনী উগরে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশ পতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে, ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু।
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহা শব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥

শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান, আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম, বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুলা মহামতি॥
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চালনন্দন॥
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥"
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত, শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
"যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদকুমারী।
(সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী॥)
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।"
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বাম পাণি॥

তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপতে॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধা চক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফেরে চক্র, অদ্ভূত নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ॥
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্র পথে॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে, মৎস্য লক্ষ্য।
ঊর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
তবে দ্রোণাচার্য্য, বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রচ্ছিদ্র পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহা শব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা, ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বাম পাণি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রচ্ছিদ্র পথে হানে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান॥
দ্রোণ দ্রোণী দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল॥

তবে কর্ণ মহাবীর স্থর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বাম হস্তে ধরি ধনু, দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
উর্দ্ধ করে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥
ছাড়িলেন বাণ, বায়ু সম বেগে ছুটে
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
স্থদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিল তিল হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ, ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া ॥
তবে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ কুমার ॥
"দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি, লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে সে দ্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ।"
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চালনন্দন ॥
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
"লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে ॥

ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা লভে সেই বীর।”
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইয়া অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য, করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ঈঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে ॥
“কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন ॥”
অর্জ্জুন বলেন “যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥”
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
“কন্যাকে দেখিয়া দ্বিজ হইলে পাগল ॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন ॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহ কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে ॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন ॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ॥”

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান॥
কিম্বা মনে করিয়াছে, দেখি এক বার।
পারিলে পাইব, নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত।
বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভনে ॥
প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥
"লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি ॥"
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি রাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, কহত নিশ্চয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্র পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে।

কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য চক্র বিন্ধিবেক যেই জন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল, "রহ রহ যাজ্ঞসেনি॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন জাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয়॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোক জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল॥

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে, করে জলে নিরীক্ষণ ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে, কেহ বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয় ॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে, তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে ॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্ব্বকাল রজনী দিবস নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয় ॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন ॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যত বার বলিবে, বিন্ধিব তত বার ॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর ॥
সুরাসুর নাগ নরে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ॥

দেখিয়া বিস্ময় ভাবে যত রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি ॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ ॥
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সহজে দরিদ্র, জীর্ণবস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান ॥
রত্ন ধন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে।
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে ॥
ব্রাহ্মণের ধনের প্রয়াস আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া ॥
দূত বলে "অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ॥
তাঁহাদের বাক্য শুন, করি নিবেদন।
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন ॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ॥

বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব ॥
আর যাহা চাহ, দিব, নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর, দিয়া দ্রুপদদুহিতা ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নি প্রায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায় ॥
"ওহে দ্বিজ, যেইমত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন জন ॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে ॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার ॥
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর, ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ।
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ ॥
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমন না হয় ॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার।
আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার ॥

মহারাজগণ ত্যজি, বরিল ব্রাহ্মণে।
এমন কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত ॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে, এই সে উচিত ॥
যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, আদি দুর্য্যোধন ॥
আর আর যত ছিল নৃপতিমণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি, ভুষণ্ডি তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণে করে অস্ত্রবৃষ্টি ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥
"না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ॥
অর্জ্জুন বলেন, "তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রাহ পাছে ॥"
কৃষ্ণা বলিলেন, "দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি ॥

অর্জ্জুন বলেন হাসি, "দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি ॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি ॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা,।
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা ॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্বাদ।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ ॥
এক দিন বসি কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিলেন দুঃখ সকরুণ ভাষে ॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে ॥
কঠিন হৃদয় তাঁর লৌহেতে গঠিল।
তিলমাত্র তেঁই মনে দয়া না জন্মিল ॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি ॥

রত্নমে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তুরী চন্দনে সদা লিপ্ত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত এবে তপস্বীর বেশে ॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কনক পাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে।
দ্বিজেরে সুবর্ণ পাত্র দেহ আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণগোসব।
আর সব্ব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব ॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলা তুমি কপট পাশায় ॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে।
ধিক্ বিধাতারে যেই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম ॥

তাহারে নিযুক্ত কৈল পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সর্ব্ব ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে॥
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে॥
দেখ এ সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে॥
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব্ব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম হয় তার পায় পশুযোনি॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য কিন্তু ত্যজিবারে নারি॥
রাজ্যলোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন॥
রাজ্যধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের কথায় নহে শতাংশে সমান॥

পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয়
অন্তকালে তাহার নরকে হয় গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি॥

অজ্ঞাতবাসাবসানে যুধিষ্ঠিরের রাজ-বেশ ধারণ।

আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ,
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া ভূষণ॥
বিরাট রাজার বাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী॥
ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন হইল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন॥
বামভাগে বসিলা দ্রুপদরাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরি দণ্ড ছাতা॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলান দুই মাদ্রীর তনয়॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাজারে কহিল॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে॥

শ্বেত শঙ্খ ধায় দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল জনে জন॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চ সখ্য ইন্দ্র যেন হইল শোভন॥
জলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক রহিলেন স্তম্ভিত হইয়া॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি মতে বসিলা তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন জ্ঞানে বসিলা আমার রাজপাটে
প্রথমে বলিলা তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে আমার না হয় অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলা প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ॥
না বুঝিয়া বসিলি অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর॥

আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোবে নাহি ভয় করে নাহি লোক লাজ।
পর স্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভা মাঝ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুব ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি॥
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ডছাতা।
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥
রে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র॥
এখন কঙ্কের সঙ্গে একি ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার॥
বচনেতে বাপের উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন।
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ বচন॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত॥
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলি ত্রাণ॥

আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কে তব ভক্তি ॥
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের কি শক্তি ॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট করিল কটূত্তর ।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর ॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে ।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে ॥
যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয় ।
তোমার আসন কি ইহাঁর যোগ্য হয় ॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে ।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ ।
ভূমি লুঠি যে আসনে করে প্রণিপাত ॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেই জন ।
কি মতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন ॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি ।
সপ্তবংশ সহ থাটে আপনি শ্রীহরি ॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর ।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর ॥
দশ কোটি হস্তী যার প্রতি দ্বারে থাকে ।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে ॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে ।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে ॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অগণন ।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জ যেন পুত্রগণ ॥

অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব নরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাবে রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুলকুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহাঁর॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন বল আর বার॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহাঁর আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা ইনি ধর্ম্ম যদি॥
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভবিখ্যাতি॥
যাহার প্রতাপে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত॥
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুই জন।
এই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারুভাষিণী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী।

যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কত দূরে।
পুনঃ পুনঃ উঠি পড়ি ধূলায় ধূসরে ॥
সবিনয় বলিলেন যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ ॥
নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।

দুর্য্যোধন মৃত্যু কথা, সঞ্জয় কহিলা তথা
ধৃতরাষ্ট্র শুনিলা প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে ॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বলে পড়িলা ক্ষিতি,
নয়নে গলয়ে জলধার।

বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমাকে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥
এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু ভাসে জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক সমতুল,
এত শোক কে সহিতে পারে ॥
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
শূন্য হৈল রাজপাট, মাণিক্য মন্দির খাট,
কোথা গেল কুরু অধিকারী ॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্য লোক,
মরিল সুহৃদ্‌বন্ধুজন।
করপুটে ভিক্ষা করি, হব গিয়া দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হবে ছারখার।

সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভব রাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন বিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
দুর্য্যোধন বধ-ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যু বাণী,
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সব করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সে জনে অর্জ্জুন মারে, এ কথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়।
যার সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাহার হইল নাশ, শুনে মনে পাই ত্রাস,
হে সঞ্জয় কি কহিলা মোরে ॥
দ্রোণ মহাবলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।

এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয় ॥
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি ধরে ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লয়ে রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ, বধিব ভীমের প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনা নগরী ॥

গান্ধারীর সহিত কৃষ্ণপাণ্ডবের কথোপকথন।

শুন দেবী গান্ধারী স্মরহ পূর্ব্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্য্যোধন
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোন্ জন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার্ বল মা আমারে ॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥

এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলিলেন অন্ধরাজরাণী॥
যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
গুরুর বচন সম করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী॥
এক পুত্রশোক লোক পাসরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে॥
শুন বাছা ভীমসেন আমার বচন।
মারিয়াছ অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধন॥
নাভির অধোতে নাহি গদার প্রহার।
ভয়ে কেন কর তুমি হেন অবিচার॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগু হয়ে যোড়হস্তে কহিলা তখন॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি।
এ কারণে করিয়াছি—ধর্ম্মচ্যুত নাহি॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এই হেতু দুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম রাখিলাম তায়॥
শুনিয়া গান্ধারী পুনঃ বলিলা বচন।
কোন্ অপরাধেতে মারিলা দুঃশাসন॥
তুমি তারে মারিয়া করিলা রক্তপান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জাতির প্রধান॥

বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন।
দুঃশাসন ছিল মাতা অতি অভাজন॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেইক্ষণ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহরি রোষ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পিয়েছি রুধির॥
প্রতিজ্ঞা রাখিতে রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর এই ক্ষণে তুমি॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
এ কারণে মারি তব শতেক কুমার॥
ভীমের বচন শুনি বলিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি॥
ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন।
কুপুত্র সুপুত্র হৌক্ মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদায় তারা মরিল সকল॥
শুন ওই বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
যাহাদের দেখে নাই কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু॥

হেন সব বন্ধুগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে ।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
ঐ দেখ গান করে নারী পতিহীনা ।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি ।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন ।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
হে কৃষ্ণ দেখ মম পুত্রের অবস্থা ।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা ॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভিত ।
সে তনু ধূলায় আজি দেখ যদুসুত ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি ।
বুঝাইবা কি বলিয়া আমাকে কংসারি ॥
পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হৃদয় ।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয় ॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক ।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক ॥
গর্ব্ভেতে ধরিয়া পরে করয়ে পালন ।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে ।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে ॥

সহিতে না পাবি আমি হৃদয়েতে তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
বুঝাইবা কি দিয়া আমাকে কৃষ্ণধন॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চবণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামব ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে কবয়ে ভক্ষণ॥
সহিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
কাতর না ছিল রণে আমাব নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখ সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি আমি দুঃখ কোন ক্রমে
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ যদুপতি না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন কৃষ্ণ তুমি॥
মরিলেক শতপুত্র না আছে সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥

জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিব রাত্রি দিনে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ কহিতে না পারি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনা নগরী॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ বাড়িলেক অতি।
পুনরপি কহিলেন বাসুদেব প্রতি॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
কিবা অনুযোগ আমি করিব তোমাকে॥
ওহে কৃষ্ণ যদুনাথ দেবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের সংহার॥
ভেদ জন্মাইলা দুই দিকে যদুপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয়ে সমান।
তাহে ভেদ করা যুক্ত নহে মতিমান্॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে॥
না আছে হিংসার লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলা তুমি কহিয়া তাহারে॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে॥
তারে বন্ধু বলি যেই করায় শমতা।
তুমি দিলা শিখাইয়া বিবাদের কথা॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে॥

বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্গে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আখি নিদ্রা গেলা মনে॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন গেল সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলা মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া॥
নারায়ণী সেনা দিলা কৌরবে সম্ভ্রমে।
ছলেতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে॥
সারথি হইলা তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ তবে রহিল কি মতে॥
তোমার উচিত ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাই দিতে তুমি না হতে সারথি॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ॥
তার পর এক কথা শুন যদুসুত।
করিলা দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলা তুমি।
চাহিলা যে পঞ্চগ্রাম শুনিয়াছি আমি॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলা তুমি পাণ্ডব নন্দনে॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে॥
আপনি করিলা ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলা কেন তবে॥

সেই কালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি।
সমস্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধযুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে॥
জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল॥
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে।
উচিত কহিতে পাছে পড় মনোদুঃখে॥
পুত্রশোকে কলেবর পুড়িছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবই তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবা নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপ॥
যেন মোর বধূ সব করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥

তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরুপাণ্ডবেতে।
যদুবংশে তথা হবে আমার শাপেতে ॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার ॥

নীতিবাক্য।

যার যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিলে ব্যর্থ হবে বেদের বচন ॥
লোক, বেদ, হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ বটে জানি
সব হৈতে শ্রেষ্ঠা হয় গণিতা জননী।
সাধুজন কর্ম্মে কভু দ্বন্দ্ব না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে ॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সে হয় অধম ॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্ম চ্যুতি নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে ॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যে মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ ॥

জলার্থীরে জল দিবে, ক্ষুধিতে ওদন।
নিদ্রার্থীরে শয্যা, আর শ্রান্তকে আসন
অতিথি আইলে ঘরে করিবে যতন ॥
কতদূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ ॥

লবকুশশরে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত শ্রীরামচন্দ্রে দেখিয়া সীতার বিলাপ।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে।
সীতার লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে ॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিত,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিত,
কমল নয়নে চাহনা চকিত,
বিদরে পরাণো কর না স্থগিত,
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে।

ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকূল আকুল হোয়েছে কোটির,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিছে তিমির,
আলো: কর প্রভু জাগিয়ে হে ॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পসিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়া হে ।
যখন ছিলাম জনক বাসেতে ।
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে.
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা ! কোথা গেলে চলিয়ে হে ॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ ! নাথ ! কি হোল আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে ।
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,

ইহা দেখি আমি বসিয়া হে ॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে।
রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানুকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ॥

কৈলাস বর্ণন।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরগণের বাস ॥
রজনী বাসর, মাস সংবৎসর, দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার ॥
তরু নানাজাতি, লতা নানা ভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল, কেশরী হস্তীরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥

সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সাব অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম, শক্র মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর, সুধার সাগর, কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে, চিন্তামণি ঘরে, বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তি মেলা, নানা রসে খেলা, দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব, সে সব কি কব, বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
নন্দী দ্বারপাল, ভৈরব বেতাল, কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্ম দৈত্য বক্ষ, গণিতে কার শকতি ॥
এক দিন হর, ক্ষুধায় কাতর, গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ, করে নিবেদন, দয়া কর কাশীবাসি ॥

অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীব তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষে কহিবারে পারি॥
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ তিনি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় কিবা দিবে বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লোটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে॥
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥

হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ॥
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল ॥

তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না ভুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈল কত কব আর॥
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণাকটাক্ষ চায় উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর॥

বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত।

সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতি বেলা।
সিতপক্ষ শশিসম বাড়ে প্রতি কলা॥
পাষাণের রেখা সম, সম চিরদিন।
নিধন হইলে তবু নাহি ভাবে ভিন॥

ইহার দৃষ্টান্ত নীর ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয় এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর ॥
জাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে ॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে ॥
এই মত সজ্জনেরা মরণ অবসরে।
যথা সাধ্য অপরের উপকার করে ॥

খলের চরিত্র।

খলের চরিত্র কিছু এমনি বিচিত্র।
কে জানিতে পারে তার কেবা শত্রু মিত্র ॥
দেখা হৈলে দূর হৈতে করয়ে সন্তোষ।
কাছে আসি বসি কহে মৃদু মৃদু ভাষ ॥
কিন্তু কুটিলতা তার প্রতি পায় পায়।
অনন্ত খলের অন্ত কেবা অন্ত পায় ॥
পরদোষ দরশনে সহস্র নয়ন।
শুনিতে পরের নিন্দা অযুত শ্রবণ।
রচিতে পরের নিন্দা সহস্র রসনা।
শত মুখ হয় হেন করয়ে বাসনা ॥
দেখিতে স্বদোষ আর সজ্জনের গুণ।
অন্ধ হয় সে দুর্ম্মতি এমনি বিগুণ ॥

বিন্ধ্যগিরি বর্ণন।

যুবরাজ চলে, অগ্রে বিন্ধ্যাচলে, করে দূরে দরশন।
দেখে পুলকিত, হয় সচকিত, আনন্দে প্রফুল্ল মন॥
ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড, করিবারে খণ্ড, করিতে মার্ত্তণ্ডরোধ।
দেখিতে প্রখর, সহস্র শিখর, ধরেছিল করি ক্রোধ॥
দেখি সুরগণে, পরমাদ গণে, সকলে মন্ত্রণা করে।
পড়িয়া সঙ্কটে, অগস্ত্য নিকটে, নিবেদন করে পরে॥
করিয়া বিরোধ, চন্দ্র সূর্য্য রোধ, করিয়াছে বিন্ধ্যগিরি।
সদা অন্ধকার, নাহি জ্ঞান কার, একি দিবা বিভাবরী॥
দেবের দুর্গতি, দেখে শীঘ্রগতি, অগস্ত্য তথায় যায়।
গিরি পেয়ে গুরু, যত্ন করে গুরু, নতি করে গুরু পায়॥
মুনি ছলে বলে, থাক ইহা বলে, কুতূহলে গেল চলে।
বিন্ধ্য শুদ্ধমতি, গুরু অনুমতি, তদবধি প্রতিপালে॥
দেখিল অমনি, স্থানে স্থানে মণি, দিনমণি যেন জ্বলে।
শাখা শাখামৃগ, বাস খগ মৃগ, তুরগে উরগ চলে॥
করে বীণা ধরি, কত বিদ্যাধরি, করিছে মধুর গান।
হৈল হৃষ্টচিত, মণিতে খচিত, নিরখিয়া নানা স্থান॥
হীরক পাথর, শোভে থরেথর, শিখরের আগে ভাগে।
করিয়া নিনদ, কত নদী নদ, পড়ে অম্নি নিম্নভাগে॥
ঢাকিয়া অম্বরে, গহ্বরে সম্বরে, শতৈক শম্বর কুল।
হরি করে করি, শত শত করি, মারি করিতেছে তুল॥
বানর ভল্লুক, গণ্ডার উল্লুক, কাছে কত পালে পালে।
গোমুখ গবয়, সবে সম বয়, সুহৃদতা ভাব পালে॥

ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, দেখিলে আপদ, আপাততঃ উপজয়।
মনুষ্যাদি গেলে, উবু উবু গেলে, নাহিক কোন সংশয় ॥
সমূরু কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ, ভ্রমে অন্য জঙ্গমেতে।
উষ্ট্র লোষ্ট্র খর, তাজি বাজি খর, ভ্রমে নিজ বিক্রমেতে ॥
যমের সোসর, হাতে ধনুঃশর, যতেক শবরগণ।
দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ব্যাকুল, ব্যগ্রে অগ্রে ছাড়ে বন ॥
দেখিয়া সবরে, কেহ বা বিবরে, উড়ে করে পলায়ন।
কেহ করি শ্রয়, লইছে আশ্রয়, কুচ্ছ্রুয়ে গহন বন ॥
অঙ্গে ঝরে ঝরে, কত রক্ত ঝরে, যেন ঝোরা ঝরে তায়।
কেহ মূর্চ্ছাগত, কার শ্বাসগত, কাহারো জীবন যায় ॥
দেখিয়া সকল, মহা কলকল, বিকল কন্দর্পকেতু।
উঠে কত দূর, হিয়ে দুরদুর, কাঁপয়ে ভয়ের হেতু ॥
নামিয়া কুহরে, শরীর সিহরে, হেবে অন্ধকারময়।
হারাইয়া দিক্, হৈল বড় দিক্, দিক্ ঠিক নাহি হয় ॥
পেয়ে বহু কষ্ট, বাহির প্রকোষ্ঠ, অকষ্টবদ্ধের ন্যায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পড়িয়া ভ্রমেতে, ক্রমেতে বাহির যায় ॥
উভয়ে সত্বরে, অভয়ে উত্তরে, উত্তরিল পরে আসি।
হয়ে নিঃশরণ্য দেখে বিন্ধ্যারণ্য, বন্য পশু রাশি রাশি ॥
তার চারিভীত, হেরে হৈল ভীত, কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুলহে বদন, এক্ষণে ভয়ে কি করে ॥

হিরণ্যনগর ও হরিহর দর্শন।

যথা দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয় ॥

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে ॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে,আকাশে দিবাকরে দেখে
হল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরি পরিতুষ্ট অতিশয় ॥
বলে, বঁধূ হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই।
চল পরিশেষে পুরি পরিসরে দোঁহে যাই।
যায় দোঁহে মেলি এই বলাবলি করি স্থির।
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধিরে বন্দিয়া দুই ধীর ॥
এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে সুবেশে দুজন।
দেখে, একে একে, থেকে থেকে সকল সদন ॥
চলে, চাইতে চাইতে চারি দিক, চল চিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত ॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর বানরী সনে সুখে ক্রীড়া করে।
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রী সাথ বসিতেন ধীর।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর ॥
দোঁহে দেখে এই দৈবদুখে দুঃখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশয়ে যথা আছে জলাশয় ॥
দেখে সুচারু সরোসিজ শোভিত সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি, সব থরেথর ॥
করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীরে সমীর, সে নীর টল টল ॥

ভেবে মনোগত ভাবে, না করিয়া পরকাশ।
নৃপ কথোপকথন করে বঁধূর সকাশ॥
দেখ বঁধূ হে কি অপরূপ সরোবর নিধি।
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজিয়াছে বিধি॥
চল. বেলা বহে যায়, আর দেখিতে সকলে।
বলে জলে চলে মজ্জন করিল কুতূহলে॥
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা. করে অতঃপর।
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর॥
ইহা করি স্থির দুই ধীর সরোবর তীরে।
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে॥
দেখে চারি পাশ কুসুম নিবাস সুশোভিত।
তার মাঝে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত॥
তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মূর্ত্তি।
হেরে হয় যে হৃদয় শতদল দল স্ফূর্ত্তি॥
মরি কিবা মূরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে॥
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ॥
আধা কপাল ফলকে শোভে অলকার পাঁতি।
আধা ধক্ ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি॥
আধা তিলক আলোক তিনলোকে করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা।
কিবা নলিন মলিনকারি নয়ন তরল।
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আখি যেন রক্তোৎপল॥

আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল ॥
আধা বনমালা গলায় ভুলায় যোগী মন ॥
আধা রুক্ষ অক্ষমালা, আলা করে ত্রিভুবন ॥
আধা কুঙ্কুম কস্তূরি হরিচন্দন চর্চ্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্ম বিভূষিত ॥
কিবা কর কিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র।
আধা অমর ডমরু করে আধা শিঙ্গা বক্র।
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া।
আধা বাঘ ছালা ভোলার ভুজগমালা বেড়া।
আধা চরণ কমলে শোভে কাঞ্চন মঞ্জীর।
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গভীর ॥
দেখে এই রূপে অপরূপ রূপ হরিহর।
রাজা পূজা বিধি যথাবিধি করে ততঃপর ॥

অতিশয় নীচ লোক, বাসে যদি আসে।
প্রিয়ভাষে সাধু তারে, তখনি সম্ভাষে ॥
সমাদর, সাধুভাব, সুজনের কাছে।
স্থল জল, আসনের অভাব কি আছে ॥
মহতের মহিমার, কি কহিব ভেদ।
তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাহি ভেদ ॥
কিছুতেই নাহি ভাবে, মান অপমান।
শত্রু আর মিত্র তার, উভয় সমান ॥

দেখ দেখ, নিশাপতি, কিবা গুণ ধরে।
ইতর বিশেষ কিছু, ভেদ নাহি করে ॥
কোথা বা চণ্ডাল নীচ, কোথা বিপ্রবর।
সমভাবে সকলের, ঘরে দেন কর ॥
কুঠারে তরুর মূল, ছেদন, যে, করে।
ছায়াদানে তরু তবু, তাপ তার হরে ॥
স্বকরে আখের মূল, যে, করে ছেদন।
মধুর আস্বাদ তারে, করে বিতরণ ॥
সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান।
যে করে, আশ্রিতজনে, আশ্রয় প্রদান ॥
তারেই, সুজন, বলে সকল সুজনে।
যে করে অভয় দান ভয়শীল জনে ॥
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মানে।
যে জন মানীর মান রাখে নিজ মানে ॥
প্রিয় বোলে বাঁধি তারে, প্রণয়ের জালে।
যে জন সহায় হয় বিপদের কালে ॥
ধনের সার্থক করি সেই পায় সুখ।
যাচকে যাহার কাছে না হয় বিমুখ ॥
অতি সাধু ধর্ম্মশীল, গুরু বলি তারে।
সুনীতি শিখায় যেই সাধু ব্যবহারে।
ধন্য তার অধ্যয়ন পণ্ডিত সেজন।
উপদেশে করে যেই সংশয় ছেদন ॥
তাহারে স্বভাবদাতা বলে সর্ব্বজনে।
অনাথ দেখিলে যার দয়া হয় মনে ॥

কেবা আত্ম কেবা পর কে বুঝিতে পারে।
যে হয় ব্যথার ব্যথী আত্ম বলি তাঁরে॥
দেশের কুশলকারী উত্তম সে জন।
যে জন নিয়ত করে বিদ্যা বিতরণ॥
তুলনা না হয় তার কাহারো সহিত।
কখনো না করে যেই পরের অহিত॥
সুশীল সুধীর সেই পুরুষের সার।
আপনার নিন্দা শুনে ক্রোধ নাহি যার॥
বিশেষ কারণে সাধু যদি করে ক্রোধ।
তবু তার মন হোতে নাহি যায় বোধ॥
সে রাগ সুরাগ তায় নাহি কিছু ভয়।
বোধের উদয় থাকে ক্রোধের সময়॥
হিতকর ক্রোধ সেই স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তায় মনের বিকার॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয় জলধির জল॥
অতএব থাকো সদা সাধু সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যার উভয় সমান॥
সুজনের প্রেমে কভু নাহি অপকার।
রোষে তোষে উপদেশে কত উপকার॥
ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ সত্যের ব্যবহার॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর॥

হয় হয় নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিজন বনে দেহ করে লয়॥
সংসার রসের তরু সহজে সরল॥
তাহাতে ফলেছে দুই সুরসাল ফল॥
এক ফল "কাব্য সুধারস আস্বাদন"
আর ফল "সুজনের সহিত মিলন"॥
হবেনা বিফল কভু হবে না বিফল।
যাহে যার অভিরুচি লহ সেই ফল॥
প্রথম ফলের স্বাদে তৃপ্ত হয় মন।
দ্বিতীয় ফলের স্বাদে সফল জীবন॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয় নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ॥
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে,
সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধৰ্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে,
ক্ষত্রিয়ের কায ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।

এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে.
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান।
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষাকু-বংশে কত বীরগণ হে.
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই ॥”

যবনদিগের দ্বারা চিতোর অধিকার।

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি-গত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ রাজ-স্থানে সমাবেশ,
তাপ তমস্বিনী পরিণত॥
যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি,
পৃথুবাজে পরাভূত করে।
হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে॥
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর॥
অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান।
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি প্রাণ॥
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারত দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায়॥
কি হইল হায় হায়! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জল।

যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
এই বার হইল সফল ॥
কি হইল হায় হায় ! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপুত রাজপুতগণ ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন ॥
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম ? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার ।
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার ॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র পসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত ।
বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত ॥
ধুনিত কার্পাস প্রায়, ফেনলালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দুর্ব্বাদল ।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল ॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি ।
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি ॥
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন ।

সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চক্ষে চঞ্চু করিছে ঘাতন ॥
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির ভিতর ।
আনন্দ-জলধি পর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর,
বাস্ত ভয়ে প্রবেশে নগর ॥

কর্ম্মদেবী হইতে উদ্ধৃত ।

রাজপুত সাধুর বিবরণ ।

যশল্মীর অন্তঃপাতি, দেশে ছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার ।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম আধার ॥
মহা পরাক্রান্ত বীর কভু নহে নত শির,
প্রতাপেতে প্রখর-তপন ।
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ॥
হঠ-ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ্ হঠ্ সদাগতি
সদাগতি পরাভূত তায় ।
দড় বড় দড় বড়, অশ্বচালনায় দড়
ছোট বড় জানা নাহি যায় ॥

হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধনিক বণিকগণ, ভীতচিত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়ে লুটে লয় ॥
বাল বৃদ্ধ বনিতারে. সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সময় রসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে ॥
বিশেষ যবন পতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফদিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে ॥
পূর্ব্বদিগে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব-অধিকার।
বিনশন মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার ॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ নাহি বারি বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু লতা।
দূরে থেকে দৃষ্ট হয় অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা ॥
তটে পুষ্প উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত পান্থ-চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভানুর এ ভাণ ॥

সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন ॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তক পরা,
অয়স্ রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্ ঝন্
ঝক্ ঝক্ ঝলক বিশদ ॥
শীতল কঠোর ধর্ম্ম অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম
সাজ শয্যা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়ে শির. নিদ্রা যেত যত বীর
কিছুমাত্র না হয়ে বিকল ॥
সেই ঢালে পিত জল সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল, ভোজন-ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস পরকাশ
তাহে সিদ্ধ নানা প্রযোজন ॥
দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা-অনল হাড়ে হাড়ে ॥
কারু প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥

হায় কোথা সেই দিন ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম।
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ.
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন. ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে দুঃখ যাবে এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন।

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী।

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি—কেন আজি পুরবাসী যত

আনন্দ সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ! কহ দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুশ্রেষ্ঠ ? কহ হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারোলে
কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ।
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর অভিমুখে ? রঘুকুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুল রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ

দিবে আজি ? আইবড় আছে কি গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—"অসত্যবাদী রঘুকুলপতি" !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চুণকালী গালে
খেদাও গহন বনে । যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোক মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেবনর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্য-প্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারতরত্ন রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্ব কথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী ।

তিন রাণী তব রাজা ! এ তিনের মাঝে;
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায় নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফেরাতে
প্রবাহে ! বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিযা তব পাপপুরী
ভিখারিণীবেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব কহিব সেখানে
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে. রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব কব তার কাছে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি" !
পুষি শারীশুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী ;—
শিখিলে এ কথা, তবে দোঁহে ছাড়ি দিব

অরণ্যে, গায়িবে তারা বসি বৃক্ষশাখে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুল পতি"।
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"!
লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"!
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গ-দেহে।
রচি গাঁথা শিখাইবে পল্লীবাল দলে;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"!
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি।
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপ পুরে।

বীরবাহু পতনে রাবণের খেদ ।

"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজ-বলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল মান এ কাল সমরে ।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ?——————
-হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"
এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী" ।
প্রণমি রাজেন্দ্র পদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর, এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জন,
সিংহনাদ , জলধির কল্লোল ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব ছুটিতে পবন,
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—
"পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ

রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগণ ; বিদ্যুতঝলা সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মারিল অরি, কে পারে গণিতে ?
"এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীমধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত"—
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা, "সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীরহিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সবে—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়ন।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,

কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন,
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ ছটা;
তরুরাজী, ফুলকুল—চক্ষুবিনোদন;
.......................হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কা, তোর পদতলে,
জগত বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা আকাশমণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্বদ্বারে দুর্ব্বার সংগ্রামে
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নববলে বলী;

উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায়রে বিষণ্ণ এবে জানকী বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী।
......অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতঃ!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায় গতিহীন এবে!
চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী, সাদি, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর আভরণ মহাতেজস্কর।

হৈমধ্বজদণ্ড হাতে, যম দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীবলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!
তবু বৎস যে হৃদয়. মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি. এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুখী—
তুমি হে জগতপিতা, একি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু বীরেন্দ্রকেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?
এই রূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে

সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গনিচয়,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ববন্ধন সেতু! রাজপথ সম
প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্! ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীমপরাক্রম। কহ, এ নিগড় তব
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

উঠ, বলি ! বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে ও প্রবল রিপু ।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে !
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনীর রোল
ঘোর রোলে । হেমাঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা
আলুথালু হায় এবে কবরী বন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন হীন বন সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা ;
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে

ঝাঁমাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্র নীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোশিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে :—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে রক্ষঃ কুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
পাখী। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূলরতন ?
দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধন।"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি সহি এ যাতনা

আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী
দেখ বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বারুইর বরজে সজারু পশি যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে ।
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, সীমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে । বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম কহিনু তোমারে !”
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে ।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি অরি,—
“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি

তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব,
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসত তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।"

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরব! দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরবনে।
মলিনবদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখবারতা!
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্বরূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেনকালে তথা

সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমাসুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া দেবী, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোটা, এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি?
কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ অলঙ্কার বুঝিতে না পারি।
কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোটা
সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলিললাটে, আহা তারারত্ন যথা।
দিয়া ফোটা পদধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম লক্ষ্মী, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে।"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকল,
চিহ্নহেতু। সেই হেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুর—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যারে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে,
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিলা রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি

ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া ।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম ।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি ।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার ভাবি দেখ মনে,
কি অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীব সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীব নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ;
"ভুলিনু, পূর্ব্বের সুখ । রাজার নন্দিনী
রঘুকুলবধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটীবনচব মধু নিরবধি ।
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বর
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি ? শিখীসহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?

অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম স্বর্ণ অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবরশিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে।—
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অমূলরতনসম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায় ! সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিব সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে !

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা, (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা!) "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে!
কে আছে সীতার আর এ অররুপুরে?
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবীকরে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌরকররাশি বেশে সুরবালাকেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষিবংশবধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখিভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগনে যেন, নব তারাবলি,
নব নিশাকান্তকান্তি। কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আসি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশালরসাল-মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে বরষি বচন-
সুধা, হায়. কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও রূপসি,
নানা কথা এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী।—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি.
সে সঙ্গীত ?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছাকরে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে মনস্থলে

তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি ভুবনমোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
সরস মধুব মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !

লক্ষ্মণের পতনে রামের খেদ।

"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃকরে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্ সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—

চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক্, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগা জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে,
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শযন—বীরবীর্য্যে, সর্ব্বভুক্‌সম,
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু ;
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনু যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী.
ব্যাকুল এ বলীদল। উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মিলি !
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধাবেন যবে
মাতা, "কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার অনুজ তোর ?" কি বলে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পনে,
প্রাণাধিক্ ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

দ্বারকানাথ রায় প্রণীত কবিতাপাঠ হইতে
উদ্ধৃত।

ওরে মানস বিহঙ্গ ২।
বিষম বিষয় বনে কর কত রঙ্গ ॥
তায় ফলে রে কেবল ২।
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ ফল ॥
তায় করিলে প্রয়াস ২।
আপাতত সুখ কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ ॥
তবে কি ফল সে ফলে ২।
যে ফল ভোজনে প্রাণ যায় রে বিফলে ॥
সে যে দেখিতে সরল ২।
কিন্তু মন জেনো তার অন্তরে গরল ॥
তারে ভাবিছ স্বহিত ২।
কিন্তু তার শত্রুভাব তোমার সহিত ॥
তারে কর সুধা জ্ঞান ২!
কিন্তু শেষে সেই হবে বিষের সমান!
কেন সে রসে বিভোর ২।
"যার লাগি চুরি কর সেই বলে চোর ॥"
তাই বলি ওরে মন ২।
রাখ রাখ অধীনের এই নিবেদন ॥
ত্যজি বিষয়ের বন ২।
জ্ঞানারণ্যে আসি বাস কর অনুক্ষণ ॥
কেন রে রসনা, সুরসে রসনা, বিরস—
বাসনা কেন রে কর।

অমল কমল, জিনিয়ে কোমল অতি নিরমল,
শরীর ধর ॥
হইয়ে কোমল, হইলে সমল, হৃদে হলাহল,
মেখেছ যেন।
হইয়ে ললিত, অমৃত সঞ্চিত, সুরসে বঞ্চিত,
হও রে কেন ॥
হইয়ে সরল, উগার গরল, একি অন্তঃখল,
ভাব তোমার।
অস্থিহীন কায়, ধরি হায় হায়, অশনির প্রায়,
কর প্রহার ॥
কিবা শোভা পায় মণি, রমণীর গলে।
কিবা শোভা পায় ধনী, পারিষদ-দলে ॥
কিবা শোভা পায় শশী, গগণ-মণ্ডলে।
কিবা শোভা পায় অসি, বীর-করতলে ॥
কিবা শোভা পায় ভৃঙ্গ, অমল কমলে।
কিবা শোভা পায় শৃঙ্গ, গিরিময় স্থলে ॥
কিবা শোভা পায় শিশু, জননীর কোলে।
কিবা শোভা পায় ইষু, সমর হিল্লোলে ॥
কিবা শোভা পায় কেশ, সুন্দরীর শিরে।
কিবা শোভা পায় বেশ, সুন্দর শরীরে ॥
কিবা শোভা পায় হাস্য, শিশুর অধরে।
কিবা শোভা পায় লাস্য, সভার ভিতরে ॥
কিন্তু পর-দুঃখে যার, আঁখি ভাসে জলে।
তার সম শোভা আর কি আছে ভূতলে ॥

হও রে চেতন মোর মানস বিঘোর রে।
মনোপুরে প্রবেশিবে নহে ছয় চোর রে॥
নবদ্বার মুক্ত তার, প্রবেশিতে কিবা ভার,
তথাপি না হয় বোধ কি কুমতি তোর রে।
হৃদয় সর্ব্বস্ব তব, হরিবে না রাখি লব,
তবু আছ বিষয়-সন্বেশে হয়ে ভোর রে॥
তাই বলি মন মোরে, ধরিতে সে ছয় চোরে,
বিজ্ঞান প্রহরী রাখ আর জ্ঞান ডোর রে॥

দেখ জ্ঞান-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে।
অন্তর-আকাশে থাকে এই সুধাকর রে॥
বিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন এই নিধি,
লয়ে সংসারের যত শোভা মনোহর রে।
দেখ রে কলঙ্কী শশী, অম্বর-আসনে বসি,
নয়ন জুড়ায় শুধু ধরি সিত কর রে।
এত অকলঙ্ক চাঁদ, মনোমৃগ-ধরা ফাঁদ,
জুড়ায় জগত-জন নয়ন অন্তর রে।
সিত-পক্ষে সুধাকর, শুধু হয় সুধাকর,
নিরন্তর সুধাকর এই শশধর রে॥

দেখ রে আমার মন ভাবিয়ে অন্তরে রে!
মানসের অন্ধকার কেবা দূর করে রে॥
দিবাকর নিশাকর, মণিগণ মনোহর,
আর দীপ-শিখা-করে বিশ্ব আলো করে রে।

অন্তরের অন্ধকার, হরিবারে সাধ্য কার,
অন্তরের অন্ধকার তারা শুধু হরে রে ॥
ধর্ম্ম ধন বিনে তবে, বল কার সাধ্য হবে.
হরিতে মনের তম এই চরাচরে রে ॥
তাই বলি ওরে মন, মহারত্ন ধর্ম্ম ধন,
কর রে সাধন সদা মহা রাগ ভরে রে ॥

ওরে মন এ কেমন চরিত তোমার।
আমার হইয়ে তুমি হলে না আমার ॥
মোর গৃহে বাস কর, মোর অন্নে প্রাণ ধর,
মোর ক্লেশে তব ক্লেশ হয় অনিবার।
মোর যদি হয় রোগ, তুমি তাহা কর ভোগ,
মোর মরণেতে মর কি কহিব আর ॥
তবু তব একি রীতি, মোর প্রতি নাহি প্রীতি,
শুধু অধর্ম্মেতে প্রীতি একি চমৎকার।
আমার হইয়ে মন, হইলে পরের ধন,
অসতী নারীর মত তোমার আচার ॥
যদি তুমি মোর হও, সদা ধর্ম্মপথে রও
ধর্ম্ম বিনে কেহ আর নাই আপনার।
অধর্ম্মেরে একেবারে কর পরিহার ॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত সদ্ভাবশতক হইতে
উদ্ধৃত।

হে ভূপ! গর্ব্ব পরিহর
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী!
তব তুল্য নরেশ কত,
শাসিত সাগরাম্বর ধরা;
সম্পদ মদ মত্ততায়,
ভাবিত তৃণতুল্য এই বিশ্বপুর
সে সব ভূপ কোথায়?
কই বা সে পদ মদ-মত্ততা
সে ক্রোধ রাগ-রঞ্জিত
লোচন, যাহা বর্ষিত অগ্নি কণা,
দীন অধীন জন প্রতি;
সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ বধিব
শ্রুতি; সে কর্কশভাষিণী-
কোমল রসনা, পর পীড়নোদ্যত
সে করযুগল কোথা হে?
মৃত্তিকায় ইদানীং পরিণত!
এই যে মম পদরেণু,
ছিল ভূপতি মস্তক অংশ এক দিন।
ধন, জন, যৌবন, সম্পদ,
রাজ্য, প্রভুত্ব, জীবন বিম্বসম
এ অনিত্য ভবমণ্ডলে,
কিছু নিত্য নহে, কিছু নিত্য নহে

অন্য করতল পরিহরি,
তব-করযুগলাগত, এ রাজ্য ; পুনঃ
কিছুকাল পরে, নিশ্চয়
হবে অন্যদীয় হস্তগামী।
নয়নরঞ্জন মনোহর,
এই যে কাঞ্চন-নির্ম্মিত পঞ্জর,
দেখিতে সুখধাম বটে,
শমন ভবনোপম মম নিকটে !
রজত কনক পাত্র স্থিত,
এই যে নানাবিধ বনফল ললিত ;
অমৃত পূরিত ভাবে পরে,
তীব্র গরল বোধ মম অন্তরে !
ধন্য স্বাধীন দ্বিজ।
কি সুখমধুপূর্ণ তব চিত্তসরসিজ !
সুখময় তব তরুকোটর।
সুধাময় তব তিক্ত ফলনিকর !
হায় ! সে দিন কি পাব ?
সদা আনন্দে উড়িয়া বেড়াব !
সুখে তরুবিটপে বসিব !
পঞ্চম তানে ললিত গাইব !
হা মঞ্জুকুঞ্জ কানন !
তব সুখময়ী মূরতি করি দরশন,
কবে নয়ন জুড়াইবে !
কবে পঞ্জর যাতনা ঘুচিবে !

ভো নভোমণ্ডল ! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ ?
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত,
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত।
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই।
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই ॥
পেয়েছ এমন অনন্ত দেহ।
অন্ত নারে তব বলিতে কেহ ॥

যে দিল তোমাবে এরূপ কায়।
বারেক দেখাতে পার কি তায় ॥
শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত রঙ্গে।
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে ॥
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে।
বাসনা আমার মানস করে ॥
বল হে আকাশ ! বল আমায়।
কোথা গেলে আমি পাইব তায় ॥

যত দিন ভবে, না হবে, না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার সম।
ঈষৎহাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম ॥
চিব সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত-বেদন, বুঝিতে পারে ?

কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ॥

কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পাদতলে ।
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে ॥
কত ভূমিপ আসন যোগ্য জন ।
উটজে করিছে দিন যাপন রে ॥
কত নির্দ্দয়চিত্ত অবোধ জনে ।
অবমানিত, উচ্চ বিচার পদ ॥

গত দিন যেই, প্রিয়জন ফুল্ল
বদন সরোজ—সুললিতবাণী—
মধুময়—হেরি, লভিত বিশুদ্ধ
সুখ মম চিত্ত, মধুকর ; অদ্য
নিরখি বিশুষ্ক, বিগলিত তাহা
কি বিষম শোকদহন দহে রে ।
অহ ! অহ ! যেই নয়ন সুচারু
কমল পলাশে, মধুকর কৈল,
দশন নিবেশ, বিঁধিত মনেতে
মম, দুখশেল, খরতর ; সেই
প্রিয়তম-নেত্রে, বলিভুক চঞ্চু,
নিরখি নিবিষ্ট, কত ধরি ধৈর্য্য
মরি মরি যার, বিরহ তিলেক,
কভু সহিবাবে, মম মন নারে,

অহ! অহ! তার, বিরহ, অনন্ত,
খরতর তাপ সহিব কিরূপে?
কেহ ভবে হাস্যমুখে সুখভোগ করে,
দুঃখের অনল কার বুকের ভিতরে!
কেহ ভ্রমে আরোহণ করি করী হয়,
বহিয়া পরের বোঝা কেহ ক্ষীণ হয়।
কার পাতে দধিদুগ্ধ অপমান পায়.
কেহ ধরে পরপদে পেটের জ্বালায!
কেহ করে সুকোমল শয়নে শয়ন,
কেহ করে তরুতলে যামিনী যাপন!
দীনের দারুণদুখ কেহ দূর করে,
বলে ছলে কেহ সদা পরধন হরে!
ধর্ম্মপথে কেহ সদা চরণ চালায়,
পাপের বিপিনে কেহ ভ্রমিয়া বেড়ায়!
কেহ ইষ্টদেবে মনে স্মরে নিরন্তর,
ভুলিয়ে রয়েছে কেহ আপন অন্তর?
কি কারণে দীন তব মলিন বদন?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ?
উদ্যমবিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

মধুসূদন বাচস্পতিকৃত ছন্দোমালা হইতে উদ্ধৃত।

পর গুণ কথনে শত মুখ হইবে
নিজ গুণ কথনে কভু রত নহিবে।
নিজ গুণ কহিলে ঘৃণিতই হইবে
গুণিগণ, গুণ সে বিগুণই গণিবে॥
প্রভুকেও চাটু বাক্য কখন না কহিবে।
শত্রুকেও কটু বাক্য কভু নাহি বলিবে॥
গল্পেতেও মিথ্যা কথা মুখে নাহি আনিবে
পরনিন্দা পরদ্বেষ কভু নাহি করিবে॥
তেজস্বীর তেজ সয়, তত দুঃখ হয় না।
তার তেজে যার তেজ, তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির কর দেখ শিরে সয় হে।
তার তেজে বালি তাতে পদে সহ্য নয় হে॥

যদি কোন ছোট লোকে বড় কথা কয় হে
বড় কথা কয়।
মহতের ক্রোধ করা কভু ভাল নয় হে
কভু ভাল নয়॥
শিশুপাল পাণ্ডবের সভামাঝে ছিল হে
সভা মাঝে ছিল।
ক্রোধভরে বাসুদেবে কত গালি দিল হে
কত গালি দিল॥

অপরে সে কটু কথা সহিতে না পারে হে
সহিতে না পারে।
নীচ বোধে মধুরিপু ক্ষমিলেন তারে হে
ক্ষমিলেন তারে ॥
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে প্রতিনাদ করে হে
প্রতিনাদ করে।
লক্ষ নাহি করে যদি ফেরু ডেকে মরে হে
ফেরু ডেকে মরে।

কোকিল বিষম কাল, কিবা তার আছে ভাল,
প্রকৃতিও দেখ তার বিষম অতি।
যে জন নিকটে যায়, সোজা চোখে নাহি চায়,
তার প্রতি রাঙ্গা আঁখি হয় কুমতি ॥
পর শিশু বধ করে, স্ব-সুত না রাখে ঘরে,
পালন না করে তারে রাখে বিদূরে।
সুধাকর সুধাকরে, জগৎ শীতল করে,
ঈর্ষ্যায় রবের ছলে ডাকে কুহুরে ॥
তবু সেই দুরাচার, প্রিয়তম সবাকার,
সুস্বর ঢাকিছে তার দোষ সকল।
তাই বলি শিশু সবে, কটুভাষী নাহি হবে,
মধুর বচনে ফলে বড় সুফল ॥

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কৃত মিত্রবিলাপ হইতে উদ্ধৃত।

মৃত মিত্রের পত্নী দর্শনে খেদ।

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশিকলা কালের কৌশলে ;
বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতী ;
কিম্বা ছিন্নবৃন্ত কুসুম যেমতি ;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্ঝটিকাজালে ঘেরে যখন,
কিম্বা মেঘপালে, আক্রমে যে কালে,
দিনরতন ;

দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুল ললিতা।
নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।
কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম-সুষমা নিল হরিয়া ;
সৌন্দর্য্য কোথারে, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

সুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী।
তমোবাসে তনু ঢাকি বিরহিণী

নীহারাশ্রুজল, বর্ষে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল ;
মিত্রপত্নী, দশা সেরূপ তব ;
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব ;
বিরহ বিকারে আছ এ সংসারে
জীয়ন্তে শব।

না ফুটিতে ফুল, না ধরিতে ফল
ললিতা লতিকা লুটাও ভূতল।
প্রণয়-বন্ধনে, যে তরু যতনে,
কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়া
ফেলিল ত্বরা সে তরু তুলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য নাই, রয়েছে সদাই,
মাটি মাখিয়া !

কেন অশ্রুজলে ভাসিছ নলিনী ?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,
চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে।
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।
সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমায় দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে,
এখন আর।

কেন বৃথা আর কাঁদ ব্রজবালা
সহিতে না পারি বিরহের জ্বালা ?
যে ক্রূর অক্রূর, নির্দ্দয় কর্ব্বূর,
লয়ে শ্যামধনে গেছে মধুপুর ;
ভেব না করিয়া যমুনা পার
আনিয়া সে ধনে দিবে আবার।
না পারে করিতে, ক্রন্দন সে চিতে,
দয়া সঞ্চার।

এই নাকি সেই সুখের প্রতিমা ?
এই ম্লানমুখী সে চারু পূর্ণিমা,
যার মৃদু হাসি, চন্দ্রিকার রাশি,
রঞ্জিত নিয়ত নিকটনিবাসী ;
যাহার আনন সুধার ধারে
সাজিত সংসার আনন্দ হারে ;
শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত,
সখী আকারে।

অরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া,
সন্তাপহারিণী ছিল যেই ছায়া,
একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার।
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল ?
কেমন স্বভাব তোর রে খল,

সুধা ছিল যথা, ঢালি কেন তথা,
দিলি গরল।

কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন
যে ছিল তোমার হৃদয়রতন
অনায়াসে তারে, অকূল পাথারে,
ফেলি চলি গেলে কোথাকারে ?
প্রেমের পুতলি ভাসিছে জলে
ডোবে ডোবে শোক সাগর তলে ;
কোমলা সরলা, অবলা বিকলা,
বিরহ বলে।

পলকে প্রলয় যাহার বিহনে
দেখিতে সতত জাগি কি স্বপনে ;
হেলায় তাহারে, ভুলি একে বারে
একা রাখি গেলে মর্ত্ত্য কারাগারে।
ধূলায় লোটায় সোণার কায়
কে করে এখন সান্ত্বনা তায় ?
নয়নের জলে বদনমণ্ডলে
স্রোত বহায়।

মৃতমিত্রের জননী দর্শনে খেদ।

কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ভিন্নবক্ষা শুক্তি ভূমে অচেতন
হৃদয়-মুকুতা কাল করিলে হরণ ?
কে ডুবিছে এই শোক-সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসীকমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে ?

এই দীনা নাকি বন্ধুর জননী ?
ধূলিধুষরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন।
কাঁদিছে কি তমোবাস পরিয়া ধরণী ?
গ্রাসিয়াছে তব রবি কালরূপ ফণী।
আসিয়াছে ভয়ঙ্কর শোকের রজনী।

কেঁদ না কেঁদ না মাগো সম্বর রোদন।
অশ্রুজলে বাড়িবে কি সে তরু আবার,
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যার ?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন ?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন ?

পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার ;
এক দল আসে আর এক দল যায় ;

আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায় ?
ইহাকে উহাকে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

বিচিত্র অঙ্গের কাঁচখণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি ;
কুৎসিৎ যা চলি যায় মনোহর বলি।
মায়া-সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান।
চৌদিকে অপূর্ব্ব পুরী করয়ে নির্ম্মাণ ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান।

মনের পিপাসা নাহি মিটে ধরাতলে।
মরীচিকা কুজ্ঝটিকা পারে কি কখন।
শীতলসলিলতৃষ্ণা করিতে হরণ ?
প্রবেশিয়া স্বর্গপুরী ধরমের বলে
না করিলে স্নান মুক্তিসরোবর জলে।
না যায় মনের তৃষ্ণা, দুখে দেহ জ্বলে।

মুহূর্ত্ত সুখদসনে দর্শন এখানে
বিজুলি ক্ষণেক খেলি জলদে লুকায় ;
পলকান্তে ইন্দ্রধনু দেখা নাহি যায়,
উঠিতে উঠিতে রবি পূর্ব্বদিক্ পানে
নীহার মুকুতা উড়ি যায় কোন খানে,
কুসুমসুষমা আর রহে না বাগানে।

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন ?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,
ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে ;—
মা তুমি কেঁদ না আর—মুছ মা নয়ন—
কাঁদিয়া কি হবে ? কর শোক সম্বরণ—
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন ?

কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।
অনুক্ষণ মা বলিয়া ডাকিব তোমায়.
ভিন্ন তুমি না ভাবিতে সখায় আমায়
ভাব গো মা এক পুত্র গিয়াছে তোমার.
অন্য পুত্র-হতে ক্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না মাগো কেদ না গো আর ;

হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষমা সম গুণ নাই কহে বুধগণ।
ক্ষমাশীল চিরসুখী আনন্দ সদন॥
রীতি মত করিলে ক্ষমার ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি হয় অপকার॥
ধর্ম্ম যথা একমাত্র শ্রমের সাধন।
বিদ্যা যথা একমাত্র তৃপ্তির কারণ॥

বীর্য্য যথা একমাত্র যশের আধার।
ক্ষমা সেইরূপ শান্তি সুখের আগার॥
ক্ষমাবর্ম্মে কলেবর আবরিত যার।
সহস্র বিপদাঘাত কি করিবে তার॥
তৃণশূন্য স্থানে বহ্নি হইলে পতিত।
বিনা যত্নে আপনি হয় প্রশমিত॥
ক্ষমাশীলে বিপদ করিয়া আক্রমণ।
আপনি পলায় নাহি করিতে যতন॥
ক্ষমার অশেষ গুণ না যায় বর্ণন।
কখনও ক্ষমা নাহি দিবে বিসর্জ্জন॥
পাণ্ডিত্যলাভের তরে বিদ্যা অধ্যয়ন।
শুন বলি পণ্ডিতের বিশেষ লক্ষণ॥
অর্থলালসায় হয়ে ব্যাকুলিত মন।
যেই জন ধর্ম্মধন না ত্যজে কখন॥
আত্মজ্ঞান তিতিক্ষা যাহার অলঙ্কার।
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥
নাস্তিকের মতে যিনি কখন না যান।
সাধুকার্য্য সাধনে যে সদা শ্রদ্ধাবান॥
পাপকার্য্য বিষবৎ পরিত্যজ্য যাঁর!
তারেই পণ্ডিত বলি, পণ্ডিত কে আর॥
যার কার্য্য আর সাধু মন্ত্রণার ফল।
উদয়ের আগে নাহি জানে শত্রুদল॥
সতত যে তোষে করি নম্র ব্যবহার!
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥

নমঃ নমঃ নারায়ণ, নিরাময় নিরঞ্জন,
সনাতন নিখিল কারণ।
তুমি নাথ অনুরাগে, এ বিশ্ব সৃজিয়া আগে,
পরে তাহা করিছ পালন।
আবার কালেতে হরি, সকল সংহার করি,
বিশ্ব খেলা করিবে নিঃশেষ।
তুমি, রজঃ তমঃ সত্ব, কে জানে তোমার তত্ব ?
তুমি তত্বাতীত ত্রিলোকেশ।
নিজে তুমি স্পৃহাশূন্য, কিন্তু করিতেছ পূর্ণ,
অসংখ্য জনের অভিলাষ।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, পরম পদার্থ মূল,
সর্ব্বাধার অজ অবিনাশ।
সবার হৃদয়মাঝ, সর্ব্বক্ষণ সুবিরাজ,
অথচ রয়েছ দূর অতি।
তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
অগতির তুমি মাত্র গতি !
হয়ে তুমি একমাত্র, না বিচারি পাত্রাপাত্র,
সর্ব্বত্র সকলে বিরাজিত।
সপ্তসিন্ধু সুশয্যায়- শায়ী, সপ্ত সাম গায়,
সপ্তস্বরে তব গুণগীত।
মুমুক্ষু যোগীন্দ্রগণ, "বিষয় হইতে মন,
সযতনে করি আকর্ষণ,
হৃদে স্থাপি জ্যোতিঃরূপে, ডুবি প্রেমানন্দ কূপে,
ধ্যান করে তব শ্রীচরণ ;

অসীম মহিমা তব, আমরা কি আর কব,
বাণী ভব পরাভব মানে,
মনোনীত বাচাতীত, তুমি নাথ সর্ব্বাতীত,
তোমার গরিমা কেবা জানে ?

সমাপ্ত ।

HAND-BOOK

OF

BENGALI LITERATURE

PART II.

COMPILED BY

MAHENDRA NATH BHATTACHARJYA M. A, B L.

Seventh Edition.

বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্,

সঙ্কলিত।

সপ্তমাঙ্কন।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

Calcutta:

PRINTED BY JODU NATH SEAL,
HARE PRESS,
55, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
148, BARANASHI GHOSE'S STREET.

1885.

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য-সংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় বার অঙ্কিত হইল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বিরচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, জীবনচরিত, সীতার বনবাস, বিধবা-বিবাহ; ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত কাদম্বরী ও রাসেলাস; শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি ও উপাসক সম্প্রদায়; শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিক্ষা-প্রণালী; ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত বেকনের সন্দর্ভের বাঙ্গালা অনুবাদ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কৃত রোমের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ কৃত রামবনবাস; ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কৃত মহাভারতের ভাষা অনুবাদ; শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ বশাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের ভাষা অনুবাদ, এবং শুভকরী, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ ও বিজ্ঞানরহস্য প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে কতিপয় প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রচারিত হইল। বিজ্ঞান-রহস্য হইতে যে কয়েকটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই কয়েকটী মাত্র এই পুস্তক প্রকাশয়িতার লিখিত। বাঙ্গালা গদ্য-লেখকদিগের আদিগুরু অশেষগুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বিরচিত প্রবন্ধ লইয়া যে পুস্তকের আরম্ভ, মাদৃশ সামান্য জন বিরচিত প্রস্তাব দিয়া তাহার উপসংহার করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

সূচীপত্র ।

			পৃষ্ঠা
রাজার প্রতি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ (বেতাল)	...	...	১
কালিদাস (সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)	...	...	২
জয়দেব ঐ	...	...	৪
সর আইজাক নিউটন (জীবন-চরিত)	...	...	৬
বিধবা-বিবাহ (বিধবা-বিবাহ)	...	...	৯
সীতার জন্য রামের খেদ (সীতার বনবাস)	...	...	১২
সন্ধ্যাবর্ণন (কাদম্বরী)	...	...	১৫
যৌবনকাল ঐ	...	...	১৭
তীর্থযাত্রা (রাসেলাস)	...	...	২০
সুখ ও জ্ঞান ঐ	...	...	২১
জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐ	...	...	২৩
পুরাবৃত্ত ঐ	...	...	২৪
সুখ ও দুঃখ ঐ	...	...	২৬
সন্ধ্যাবর্ণন (চারুপাঠ)	...	...	২৬
মিত্রতা ঐ	...	...	২৭
কীর্ত্তিমন্দির ঐ	...	...	২৮
সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক (ঐ)	...	...	৩০
শারীরিক স্বাস্থ্যসাধন (ধর্ম্মনীতি)	...	...	৩৪
আর্য্যদিগের আগমন (উপাসক সম্প্রদায়)	...	...	৩৭
শিক্ষক (শিক্ষাপ্রণালী)	...	...	৩৯
উচ্চপদ (বেকনের সন্দর্ভ)	...	...	৪১
ব্যয় (ঐ)	...	...	৪৩
অসূয়া ও মাৎসর্য্য (ঐ)	...	...	৪৫

পৃষ্ঠ

শাস্ত্রচর্চ্চা (বেকনের সন্দর্ভ) ৪৬
সন্দেহ (ঐ) ৪৭
পুরাবৃত্ত-পাঠের ফল (রোমের ইতিহাস) ৪৮
রোম ও রোমক ৪৯
রোমের রাজা ৫২
ভরতের চিত্রকূট গমন (রাম বনবাস) ৫৪
মহাভারত (৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কৃত মহাভারতের ভাষা অনুবাদ) ৬১
মহাভারতীয় কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ঐ) ৬৬
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর (ঐ) ৭০
ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ (ঐ) ৭৩
সমুদ্রমন্থন (বরদাপ্রসাদ বশাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ) ... ৭৬
লিস্‌বনের ভূমিকম্প (শুভকরী) ৮৪
ইলোরার গুহা (বিবিধার্থ সংগ্রহ) ৯৩
লঙ্কাদ্বীপ (ঐ) ৯৭
পম্পেয়াই (রহস্য সন্দর্ভ) ১০১
বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অবস্থা (বিজ্ঞান রহস্য) ১০৭
বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনের ফল (ঐ) ১১০
বায়ুরাশি (ঐ) ১১৪
শিশির (ঐ) ১১৮
পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ভাব (ঐ) ১২০
মহাসাগর (ঐ) ১২২
সূর্য্য (ঐ) ১২৯

সাহিত্য-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

—()—

রাজার প্রতি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।

যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধিজলে নিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন: যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি যমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবন ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে দশরথ-গৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ

হইয়া বানরসৈন্যসমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতিদ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণপূর্ব্বক বেদবিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন; সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনকার রক্ষা করুন।

কালিদাস।

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সেইসর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদনে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোন দেশের কোন

কবি আমাদিগের কালিদাসের ন্যায় সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত-কাব্য-সমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ কবিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্তহৃদয়-গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর; বোধ হয়, কোন দেশেব কোন কবি উপমা-বিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপমা সংকলন কবেন যে, পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়েব সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনাব আদর্শস্বরূপ হইয়াছে; যাঁহারা তাঁহাব পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত; তিনি একটিও অনাবশ্যক, অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাব সঙ্কলনের নিমিত্ত একমুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই; বস্তুতঃ এরূপ

রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি, এই উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে কালিদাসকে "কবিকুলগুরু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং এই নিমিত্তই কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কালিদাসের নাম দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

কালিদাস এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি, এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "যেমন বামন উন্নতপুরুষ-প্রাপ্য-ফল-গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।" কালিদাস অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং উনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

জয়দেব।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। বীরভূমির প্রায়ঃ দশক্রোশ দক্ষিণে অজয়-নদের উত্তর তীরে কেন্দুলিনামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্বনামে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলিগ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থ, প্রতিবৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

গীতগোবিন্দ জয়দেব-প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায়ঃ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্ব-শক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃতকবি হইয়াছেন ইনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সংগীতসমূহে রাগ তানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন।

নিউটন কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোক পদার্থের তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ, অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপক-গুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকোণবিশিষ্ট এক খণ্ড কাচ লইয়া কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এপ্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর অসাধারণ কৌশলপূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন—আলোক পদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল, এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে, এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

এক দিবস নিউটন উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের

পতননিয়ামক সাধারণকারণবিষয়ক পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণানুসারে আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম প্রকাশিত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; এবং তাঁহারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সমুচিত সমাদর করিতেন। কথোপকথনকালে আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই তাঁহার সহবাস বাসনা করিত। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইলেও, তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত সময়াল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলেই হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন; এবং কহিতেন, যাহারা জীবদ্দশায় দান না করে, তাহাদের দান,

দানই নয। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। আর আহারনিয়ম, সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতি দীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই, তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধসহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০এ মার্চ্চ চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন; এবং যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও মহার্থলাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয় জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুদিগের কক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।

নিউটন আলোক ও বর্ণ, এই উভয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদয় হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর তাঁহার সমুদায় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপ লোকোত্তরবুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ, এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে যে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি; কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিধবা বিবাহ।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার--দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সংকল্প করিয়া লৌকিক রক্ষা-ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কলিত লৌকিকরক্ষা-ব্রতের উদযাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা-দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন; তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রনানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, * * * কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর

পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আব দুঃখ বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রনা বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়; কিন্তু তোমাদেব এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহবণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসার-তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই. ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত-বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না কবে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিস। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারেব পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেবাও তোব অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া

কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।

সীতাকে বনবাস দিতে হইবে ভাবিয়া রামের খেদ।

হায়! এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুভ্রমে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম, নতুবা বিনা অপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই; আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যপ্রায় বোধ হইয়াছে।

হাঃ মাত! হা তাত জনক! হা দেব বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র!

হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতেছ না, এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকীর নাম গ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধাচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীরে নিতান্ত নিরপরাধী জানিয়াও, অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে? পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব কেন?

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, উচ্ছ্বলিত শোকাবেগ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া, সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আসনপরিগ্রহ করিয়া, কাতরনয়নে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে তাঁহারাও, যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণবচনে

জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য! আপনকার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখন অল্প কারণে আকুলিত হয় না, সামান্য বায়ুবেগপ্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়াগিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপস্থিতিতে বলপূর্ব্বক সীতারে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

সীতা একাকিনী সেই দুর্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে, আমরা সুগ্রীবের সহায়তায়, সেই দুরাচারের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে আনিয়াছি, ইহাতে পৌরগণ ও জানপদ-বর্গ অসন্তোষ প্রদর্শন ও অযশ ঘোষণা করিতেছে। এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে পরিত্যাগ করিব। সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায়, বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা প্রশান্ত-মনে অনুমোদন প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

সন্ধ্যাকালে তপোবনের শোভা।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন সহিত যে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে, এবং তদনন্তর পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখা সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলীসঙ্কেত দ্বারা

আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল, এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিনবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্ব দিক্ দশনবিকাশপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমমৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।

যৌবনকাল।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্॥

যৌবন অতিবিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে একপ্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়-তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থসম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহ-ঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই; প্রভুজনেরা অধীন লোক-দিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না।

তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণহইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণে স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ড কি প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত হয়। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতি-শব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারি-ষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া

তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার, ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিস্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্যপরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয় এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। নির্ব্বোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তিরাই

চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ। সাধু-গর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? পরিণামবিরস বিষয় ভোগে যাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়। তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মত্ত হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্জু বলিয়া কাল-সর্প ধরে।

তীর্থযাত্রা।

অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায়, তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ বুঝিয়া কখন বা সৎকর্ম্ম, কখন বা মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সত্যানুসন্ধান আবশ্যক, তাহা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, অনুসন্ধান করিলেও সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধি ও চিত্ত প্রসন্ন হইবেক এই উদ্দেশে স্থান পরিবর্ত্ত করাও উচিত নয়; কারণ, স্থান পরিবর্ত্ত দ্বারা মনের চাঞ্চল্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বকালে গুরুতর ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করিলে মনে সেই সেই ঘটনা জাগ্রতী থাকে। এই নিমিত্ত যে স্থান হইতে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, লোক তথায় গমন করে এবং তথায় যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল,

নিরন্তর তাহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্ম্মনিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা। তীর্থবিশেষে ভ্রমণ করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ হইবেন এই উদ্দেশে যাহারা তীর্থযাত্রা করে তাহাদিগের পর ভ্রান্ত ও মিথ্যাধর্ম্মপরায়ণ আর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে তীর্থে যাইলে মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিবেক, মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাপকর্ম্মেরও অনেক নিবৃত্তি হইবেক, তাঁহারাও ভ্রান্ত বটেন, কিন্তু এই উদ্দেশে যাইলে তাঁহাদিগেব তাদৃশ দোষ দেওয়া যায় না। যিনি মনে করেন তীর্থে যাইলে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদয় পাপ মোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অন্ধ। এইরূপ ভাবিলে পবিত্র ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাশক্তির অপমান করা হয়।

সুখের এক প্রধান কারণ জ্ঞান।

সুখ দুঃখের কারণপরম্পরা এত বিস্তৃত, এমত নির্দ্ধারিত, এত জটিল, অবান্তর কারণবশতঃ এত বিভিন্নপ্রকার ও দৈবের এত পরতন্ত্র যে, সুখ দুঃখ ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি যুক্তিশক্তি দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়া কোন অবস্থা অবলম্বন করিতে উৎসুক হন, অন্বেষণ ও বিচার করিতে করিতেই তাঁহার কালক্ষেপ হয়। পরন্তু জ্ঞান যে সুখের এক প্রধান কারণ, তাহায় সংশয় নাই। জ্ঞান সুখের কারণ না হইলে কেহই জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা পাইত না। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তদ্দ্বারা কিছুই বৃদ্ধি

হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাবস্থায় কোন বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না সে সময় অন্তঃকরণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়া থাকে। যখন আমরা কিছু শিখিতে পারি, আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মে। যখন কিছু ভূলিয়া যাই, তখন অনুতাপ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে যে, যখন জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তৎকালে আমরা যত শিখিতে ও যত জানিতে পারি এবং আমাদিগের মন যত বিস্তৃত ও বহুবিষয়ী হইতে থাকে, ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ সুখসামগ্রী ধরিয়া সুখের গণনা করা যায়, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগেরই অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ ও যে আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় অথবা সংশয়াপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহারা অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন। শীত, বাত, আতপাদি জন্য আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সহজে নিবারণ করিতে সক্ষম। আমরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে যে কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা তাঁহারা কলে কৌশলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহাদিগের এরূপ যোগাযোগ আছে যে, আপনাপন বন্ধুবান্ধব হইতে কেহ দূরবর্ত্তী নয় বলিলেও বলা যায়। তাঁহাদিগের রাজনীতি-কৌশলে জনসমাজের অনেক দুঃখ নিবারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা পর্ব্বতের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে পারেন, নদীর উপর দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা

যে সকলগৃহে বাস করেন তাহা স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য ও বহুকাল-স্থায়ী। তাঁহাদিগের বিষয়াদিও নিরাপদে রক্ষিত হইয়া থাকে।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ও নীতিশাস্ত্রের উপদেশক।

জিতেন্দ্রিয় লোকেরা ভয়েরও দাস নয়, আশারও অধীন নয়, ঈর্ষারও পরতন্ত্র নয়, ক্রোধেও প্রজ্বলিত হয় না, লোভেও মুগ্ধ হয় না, মমতা ও স্নেহেও আর্দ্র হইয়া যায় না। গগনমণ্ডল যখন নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত থাকে অথবা যৎকালে নভোমণ্ডলে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, উভয় কালেই দিনমণি যেরূপ সমভাবে গতায়াত করেন, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তমূর্ত্তি হইয়া অবিকৃতচিত্তে ও সমভাবে সংসারের তরঙ্গ সহ্য করেন, ও নির্জ্জন প্রদেশসুলভ সুখ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন; কোন কালেই তাঁহার অবিচলিত চিত্ত বিকৃত হয় না।

নীতিশাস্ত্রের উপদেশকদিগকে সহসা বিশ্বাস বা প্রশংসা করা উচিত নয়। তাঁহারা যখন বাগাড়ম্বর করেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের চবিত্র মনুষ্যেব চরিত্র অপেক্ষা পবিত্র বা উৎকৃষ্ট নয়।

পুরাবৃত্ত-পাঠের ফল।

কোন বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্ কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্তমান বিষয় যথার্থরূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে, ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না। আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি এবং নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ অতীত ঘটনার কার্য্য-স্বরূপ। ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক আছে। অনুরাগ ও ঘৃণা অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে; যেহেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।

বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্যস্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে।

কিন্তু পুরাবৃত্ত-পাঠ ব্যতিরেকে উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত-পাঠদ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারি এবং বিপদ্ ও দুঃখ নিবারণের অনেক উপায় শিখিতে পারি। যে সময়ে আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্ত-পাঠে অমনোযোগী হইলে, বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম। যেহেতু, ইচ্ছাপূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা এবং অনিষ্ট নিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম।

পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীবের আলোক ও অন্ধকার স্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, শিল্পবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব, অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও অভিপ্রায় পরিবর্ত্তের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষা উহা সমধিক উপকারজনক ও সাতিশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ ও আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া রাজাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁহাদের উচিত নয়।

সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ।

এইরূপ এক গল্প আছে,—যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তখন মানবেরা প্রথম রাত্রির আগমনে স্থির করিল যে, আর দিন হইবেক না। সেইরূপ আকস্মিক দুঃসহ দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আমরাও প্রথমে স্থির করি যে, এইরূপ দুঃখেই চিরকাল যাইবেক, কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। ফলতঃ যখন দুঃখ-রূপ মেঘ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আসিয়া বিস্তীর্ণ হয়, তখন তাহার অভ্যন্তর দিয়া কিছুমাত্র আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং সেই মেঘ কিরূপে অপসারিত হইবেক তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু দিবাবসানে যেরূপ রাত্রি এবং রাত্রির বিগমে যেরূপ উজ্জ্বল ও আলোকময় দিন দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পরেও সুখের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা-সমাগমে যমুনার শোভা।

এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্যলাবণ্য-শোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজ-

মান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণপূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামলবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল; পশু পক্ষী সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল; এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

মিত্রতা।

কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি * উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু ব্যতিরেকে এ সংসার একটী অরণ্যমাত্র। অপর এক মহাত্মা † নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি ‡ লিখিয়া গিয়াছেন, সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুইটী সুরস ফল বিদ্যমান আছে; কাব্যরূপ অমৃতরসের আস্বাদ ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান,

* বেকন। † সিসিরো। ‡ হিতোপদেশকর্ত্তা।

দুঃখ কি কঠোর পদার্থ, তিনি অবগত নহেন। যিনি বন্ধু-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু ব্যতি-রেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনই মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাপিত চিত্ত শীতল হয়, বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত, শোকসন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধর-যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদলাভ হয়, সেইরূপ, প্রিয়বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষ সহ প্রবোধ সুধার সঞ্চার হয়।

কীর্ত্তিদেবীর মন্দির।

কীর্ত্তিদেবীর পার্শ্বে যে সমুদায় মহানুভব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকা-চ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন, এবং আনন্দোৎ-

ফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতিরূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কতিপয় পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র বিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহাদের হস্তস্থিত পুস্তকের কেমন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে পথ প্রদান করিল। দুই শ্মশ্রুধারী, সহাস্য বদন, প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্য-স্থল-বর্ত্তি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। শুনিলাম, এক জনের নাম বাল্মীকি, আর এক জনের নাম হোমর। দক্ষিণভাগে হোমর এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং স্বকীয় সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত করিতেছিলেন। তিনি নাকি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি বিশেষের সভাসদ্ থাকিয়া নৃপতি অপেক্ষাও শতগুণে কীর্ত্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ-শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এপ্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ওদিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জিল, দান্তে, মিল্‌টন্, সেক্সপিয়র প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি অবস্থিত ছিলেন। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে মোহিত হইয়া গেল।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয় জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমা-বস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যা-লোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির

অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট-সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নির্ব্বৃত থাকিয়া নিকৃষ্ট-সুখাধিকারী নিকৃষ্ট-জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্খ্য বিষয়ের অসঙ্খ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক-নিবাসী হইয়াও কোন চমৎকারময়, সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণবপরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপ পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্‌বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদধারিণী পর্ব্বতশ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুযার-শৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ, ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎ-

সংক্রান্ত, ভূগর্ভ-বিনির্গত, গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখর দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটনপূর্ব্বক হিমগিরিশিখরে উত্থিত হইয়া নত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণ-তলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জল-প্রপাত ত্বরিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্রসলিলে করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালে সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানের কতপ্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্র-গণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, ধাতু, প্রভৃতি পর্য্যা-লোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ লতা গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন জাতি

দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সম্বলিত-সুখামৃত রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয় অনুশীলন করিবার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময় তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে নয়ন-দ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্ব-ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকার ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সম্বলিত অপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বর্ত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ষট্‌চন্দ্র-সহকৃত হর্ষেল গ্রহ, এবং চন্দ্রদ্বয়-সম্বলিত নেপ্‌চ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্র-লোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশমণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে

মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সঙ্খ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপারমহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার-স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগন-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোনপ্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, ও সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিন যাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘ ই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কু-চিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্টেসৃষ্টে কাল হরণ করা তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্টপ্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য-সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষেই উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধরিপু প্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্য-বদন, পীড়িত হইলে সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়; তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং অদ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্-ঘর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগশান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।

অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও সচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ, শরীর ভগ্ন হইলে ঐ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণারূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তরপুত্র-কন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা, আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এইমাত্র বিশেষ। অতএব পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর-রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়মসংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; না করিলে প্রত্যবায় আছে।

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে যে অত্যুন্নত অতিদুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করে, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে * তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারত-ভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী † জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী-রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ-মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজাল-বৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এককালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিলসুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহারও আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকর-স্বরূপ যে আয়ুঃপ্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগ-জীর্ণ বিবর্ণ

---

* কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, এইরূপ জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও পুস্তকমধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

† ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, বৈশেষিকাদি দর্শন শাস্ত্র।

মুখ-মণ্ডলকে স্বাস্থ্য-গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ-বিশেষের শক্তি-যোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিমনিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে এবং সেদিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ শূর-শেখর শিখ-জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হল-যন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন—ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র শাখা-সমন্বিত সলিল-পূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষ-দিগের পদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি অসম্বদ্ধ অলীকবৎ প্রলাপ-বাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়।

আমর তখন অনাগত-কাল গর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সমস্ত স্বপ্ন-কল্পিত বাসনার এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল!

শিক্ষক।

শিক্ষকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একান্ত দুরূহ। মনোগত ভাব সকল বাক্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করাই কঠিন কর্ম্ম। আবার সেই সকল ভাব ও অন্যের লেখার ভাব বাক্য দ্বারা বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া বিভিন্নপ্রকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যে কত কঠিন তাহা বলা যায় না। অনেক সুবিজ্ঞ শিক্ষকের উপদেশ ছাত্রগণের সুখবোধ না হওয়াতে মরু-ভূমি-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যেরূপ যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বীজ বপন করিলে শস্য-সম্পত্তি লাভ হয় না, সেইরূপ অনেক বালকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি সুশোভনা থাকিলেও যে যেমন পাত্র তাহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান না করিলে বালকদিগের সুশিক্ষা লাভ হইতে পারে না। কৃষিকর্ম্মের সহিত শিক্ষকতা কার্য্যের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন কোন্ সময়ে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা জানা কৃষকের পক্ষে সবিশেষ আবশ্যক, সেইরূপ কোন্ সময়ে কিরূপ উপদেশ দিলে তাহারা তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা জ্ঞাত হওয়া শিক্ষকেরও নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষেত্র-কর্ষণ, সার-ক্ষেপণ, যথাকালে বীজ-বপন, সময়োচিত বারি-

সেচন, এবং অনিষ্টকর কণ্টক প্রভৃতি উৎক্ষেপণ না করিলে যেমন কৃষকের শ্রম সম্যক্‌রূপে সফল হওয়া দুর্ঘট হয়, সেই-রূপ শিশুদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিস্তেজ করিয়া তাহাদিগের সুকোমল মানসক্ষেত্রকে উপদেশ-গ্রহণক্ষম না করিলে, যথা-কালে সদুপদেশরূপ বীজ বপন না করিলে, এবং দৃষ্টান্তদ্বারা উপদেশের প্রামাণ্য ও উপযোগিতা সংস্থাপন না করিলে, কোন শিক্ষকই সফলপ্রয়াস হইতে পারেন না। যাঁহারা কিছুকাল অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের কাঠিন্য অনুভব করিয়াছেন। যাঁহার উপরে বহুবালকের শিক্ষাদান-কার্য্যের ভার সমর্পিত থাকে, কেবল উপদেশ দান করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন হয় না, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, ও দণ্ডনেতার কার্য্যও করিতে হয়।

যাঁহার উপদেশ-বলে বলবীর্য্যবিহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেচনারহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃৎপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্যবান্ জ্ঞানালোকসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার উপদেশ-বলে জন্মকালে সর্ব্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও মনুষ্য আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পরে সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার উপদেশ-বলে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া পরম পবিত্র প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিরতিশয় সুখসাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য

জগদীশ্বরের পরমাদ্ভুত সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অনুপম করুণা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এককালে বিমোহিত হইতে থাকেন, এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণপূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরম পবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপাদ, ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না; কারণ, বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্ম্মোপদেশদান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশদানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক।

উচ্চপদ।

অনেকে উচ্চ পদ কামনা করেন, কিন্তু উচ্চ পদে অসুখ বিস্তর। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও ধর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কার্য্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক প্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম।

কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা নিতান্ত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্ট-তরে পড়ে এবং কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান-পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোক্ পড়ে, এবং তাহারা তিল প্রমাণ দোষকে তালপ্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সংবরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্যরূপে থাকিতে ভালবাসেনা। সকলে বড় পদ স্পৃহণীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই। তাহারা পরের মুখে অন্ন চাকে এবং আপনাদিগের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে দুঃখ বই সুখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না। আপনারা যে দুঃখের ভাগী শীঘ্রই বুঝিতে পারে, কিন্তু আপনারা যে দোষের ভাগী তত শীঘ্র বোধ করিতে পারে না। তাহাদিগের চিত্ত কার্য্যচিন্তায় এত কবলিত ও ব্যাসক্ত থাকে যে আত্মানুসন্ধান করিবার অবকাশ থাকে না। সকলের কাছে পরিচিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা একপ্রকার বিপদ সন্দেহ নাই।

কর্কশ হইও না। অনর্থক কার্কশ্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোককে চটাইবার আবশ্যক কি। খর হইলে লোকে ভয় করে বটে, কিন্তু কর্কশকে লোকে ঘৃণা করে। তর্জ্জন বা তিরস্কার করিবার সময়েও বিদ্রূপ করা উচিত নয়। আপনার আসনস্থ হইয়া সুহৃজ্জন বা গুরুজনের অনুরোধ-রক্ষার্থ ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না। অনুরোধ রক্ষার্থ কর্ত্তব্য অবহেলন, উৎকোচহরণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ। সকলের কিছু উৎকোচ দিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কোনপ্রকার অঙ্গাঙ্গিভাব অনুসন্ধানপূর্ব্বক উপরোধ জুটাইয়া আনা অতি সহজ, সুতরাং এরূপ পক্ষপাতী ব্যক্তির সর্ব্বদাই অপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। একটী প্রাচীন গাথা আছে "পদস্থ হইলে লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সজ্জন বা দুর্জ্জন অনায়াসেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।"

ব্যয়।

ধন, শুদ্ধ মান ও সৎকর্ম্মে ব্যয়ের নিমিত্ত, ধনে আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে বিত্তশাঠ্য করা অতি গর্হিত। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে, কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এখন উদার ও মুক্তহস্ত হইলে পরিণামে রিক্ত হস্ত হইতে হইবে। আর ইহাও সাবধান থাকা উচিত যেন উপজীবিগণ কোনরূপে না ঠকাইতে পারে। বাহিরে এরূপ সম্ভ্রম রক্ষা

করিবে যে, লোকে যত মনে করে তদপেক্ষা স্বল্প ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। যদি শুদ্ধ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইলেই পরিতুষ্ট হও, তবে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিবে, আর যদি সম্পন্ন হইতে চাও, তবে তৃতীয়াংশ মাত্র। হাজার বড় হইলেও আপনার বিষয় আপনি পর্য্যবেক্ষণ করা কখন ক্ষুদ্রতার কর্ম্ম নহে। পাছে ভগ্ন দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হয় বলিয়া অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাহা হইলে উত্তরোত্তর আরও ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিকারস্থান না দেখিলে কিরূপে প্রতীকারের আরম্ভ হইতে পারে। যাঁহারা স্বয়ং বিষয় রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত করিবার সময় অনেক বাছিতে হয়, ও মধ্যে মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্ত্ত করিতে হয়, নতুবা পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তারা কিছুদিনের পর প্রভুর রাশি বুঝিয়া লয় এবং ক্রমে ভয়-ভাঙ্গা হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিতে ক্রটি করে না।

যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভূত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি ভদ্রাসনের অনেক আড়ম্বর প্রকাশ কর, তবে যান বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। নতুবা একবারে চারিদিকে মুক্ত হস্ত হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

যদি ঋণ থাকে ক্রমে পরিশোধ কর, এক বারে আনৃণ্যগ্রহণার্থ সহসা বিষয় বিক্রয় করিলে উচিত মূল্য হইবে না, অবশ্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমে পরিশোধনের আর এক গুণ এই যে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া

আইসে। কিন্তু একেবারে শুধিয়া ফেলিলে আবার অপ্রতুল ও আবার ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

অসূয়া ও মাৎসর্য্য।

গুণহীন ব্যক্তি পরকে গুণবান্ দেখিলে অসূয়া করে। লোকে হয় আপনার ভাল, নয় পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাসে। যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহাদিগের চোখ টাটিয়া উঠে, এনিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্য লোপার্থ অসূয়া করে। যাহাদিগের আত্মচিন্তা নাই, শুদ্ধ পরসংক্রান্ত তাবদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে অত্যন্ত কুতূহল, তাহাদিগকে অসূয়স্বভাব জানিবে। যাহাদিগের প্রাধান্য কুলক্রমাগত, তাহারা একজন কুল-মর্য্যাদা-শূন্য প্রাকৃত ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে অসূয়া করে। বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ, কঞ্চুকী ও জারজেরা প্রায় অসূয়স্বভাব হইয়া থাকে, কেন না তাহাদিগের নিজের অবস্থা সংশোধনের কোন উপায় নাই, পরকে খাট না করিলে তাহাদিগের আত্মাদর চরিতার্থ হয় না।

অভ্যুদয়ের সময় সাটোপ-বচনে লোকের উপর প্রভুতা প্রকাশ করিলে বা আড়ম্বর সহকারে আত্মশ্লাঘা করিলে অসূয়া-ভাজন হইতে হয়, এনিমিত্ত বিজ্ঞেরা কখন কখন অতি সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট তুচ্ছ বিষয়ে পরিভব স্বীকার দ্বারা নিজ লাঘব ভানপূর্ব্বক তাহাদিগের গৌরব রক্ষা করেন। তাহাতে লোকে বিষয়-বিশেষে তদীয় ন্যূনতা দেখিয়া কিছু

সন্তুষ্ট থাকে এবং তত অসূয়া করে না। আবার কখন কখন এরূপও দেখা যায়, কিঞ্চিৎ সাহঙ্কার বচনে নিজ গুণের গৌরব প্রকাশ না করিলে লোকে অতি মৃদু ও অযোগ্যম্মন্য মনে করে। নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। লোকে যাঁহাকে অসূয়া করে তাঁহার কিছুতেই মনের সুখ নাই, একবার অসূয়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িলে অতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানও লোকে স্বার্থ বা দুরভিসন্ধিমূলক মনে করে। অসূয়ুরা নিঃস্বার্থ পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাকেই খলতা কহে। খলেরা কোনরূপ অপকারে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে অন্ততঃ অমূলক অখ্যাতি করিয়াও নিজ নীচতা ব্যক্ত করে। অন্যান্য অন্তঃকরণ বৃত্তির বিশ্রাম আছে, সর্ব্বদা আবির্ভাব দশায় থাকে না, কাল ও বিষয় অপেক্ষা করে, কিন্তু কাম ও অসূয়া সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিয়া মন কলুষিত করিয়া রাখে।

শাস্ত্র-চর্চ্চা।

অধ্যয়নে বহুদর্শী হয়; অন্যের সহিত আলোচনে উপস্থিত বক্তা হয়; রচনা লিখনে পাকা সংস্কার হয়। যদি তোমার রচনা অভ্যাস না থাকে, তবে অসাধারণ মেধা থাকা চাই; যদি অন্যের সহিত অনুশীলন না কর, তবে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তবে ন্যূনতা ঢাকিবার নিমিত্ত অনেক ফন্দি করিতে হইবে, নতুবা সম্ভ্রম রক্ষা হইবে না।

ইতিহাসে বিজ্ঞতা জন্মে; সাহিত্যে যুক্তিনৈপুণ্য হয়; পদার্থবিদ্যায় গাম্ভীর্য্য জন্মে ; ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা হয় ; তর্ক-শাস্ত্রে বাদনৈপুণ্য লাভ হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগত দৌর্ব্বল্য পরিহৃত হয়, সেইরূপ ভিন্নভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অনুশীলনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আন্তরিক ন্যূনতা পরিহৃত হয়।

সন্দেহ।

অনেকে সব বিষয়েই সন্দেহ করে, কিছুতেই তাহাদিগের মনঃপূত হয় না, তাহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে না ও তুচ্ছ ছল ধরিয়া লোকের নানা দুরভিসন্ধি কল্পনা করত সর্ব্বদাই মন কষায়িত করিয়া রাখে। এরূপ অভ্যাস সংশোধন করা অতি আবশ্যক। সন্দিগ্ধাত্মা ব্যক্তির মন কখনই প্রফুল্ল থাকে না, সর্ব্বদাই বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে, কোন কার্য্যই সুচারু ও অব্যাহতরূপে নিষ্পন্ন হয় না। রাজা সন্দিগ্ধাত্মা হইলে প্রজা-পীড়ক হয়েন, বিজ্ঞজন সন্দেহী হইলে অব্যবস্থিত-চিত্ত ও বিষণ্ণস্বভাব হয়েন। ঈদৃশ-স্বভাব ব্যক্তিরাই অকারণে ভার্য্যার ব্যাভিচার শঙ্কা করেন এবং তন্নিবন্ধন অতি বিশুদ্ধ দাম্পত্য-সুখে একেবারে বঞ্চিত হয়েন। অশিক্ষিত বা নির্ব্বোধ হইলেই যে সন্দিগ্ধস্বভাব হয় এমত নহে। সন্দেহ একপ্রকার রোগ, মতিমান্ ব্যক্তিদিগকেও কখন কখন ঐ রোগে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সন্দেহ পুষিয়া রাখেন না, কোন সন্দেহ উদয় হইলে বিলক্ষণ বিবেচনা-

পূর্ব্বক তাহার একতর কোটি অবধারণ করেন। কিন্তু মূঢ় ও তামস-স্বভাব ব্যক্তিদিগের সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হয়।

অনেকে খলতাপূর্ব্বক সাধুজনের প্রতি লোকের মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়া দেয়। যখন কোন সাধু ব্যক্তির উপর উক্তরূপে তোমার সন্দেহ জন্মে, তখন তাঁহারে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলা উচিত, এবং যে নিমিত্তে তোমার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা খুলিয়া অবগত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে, হয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মুখে সমুদায় বিবরণ শুনিয়া একেবারে সকল সন্দেহ অপগত হইতে পারে, আর নয় সে ব্যক্তি সেই অবধি পূর্ব্বরূপ সন্দেহজনক আচরণ হইতে বিরত হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা স্বভাবতঃ নীচ ও ক্ষুদ্র, তাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশটী খাটে না, তাহারা একেবার অকারণে সন্দেহ ভাজন বলিয়া জানিতে পারিলে জন্মের মত সাধু ব্যবহার বিসর্জ্জন দেয়।

পুরাবৃত্ত-পাঠের ফল।

জীবনচরিত-পাঠে যে উপকার লাভ হইয়া থাকে, ইতিহাস-পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ হয়। জীবনচরিত পাঠ করিলে কেবল একব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাস পাঠ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবনচরিতে কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া থাকে.

ইতিহাসে সহস্র সহস্র ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। ফলতঃ ইতিহাস সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনচরিত স্বরূপ। কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে উন্নতি লাভ করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে, কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, কোন্ জাতি প্রথমে সভ্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া কি দোষে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কোন্ জাতি কি দোষ থাকাতে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, ইতিহাস-পাঠ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই মানুষের আপনার অবস্থা সংশোধন করিয়া উচ্চ পদে আরোহণ করিতে অভিলাষ হয়, এবং যে যে দোষ থাকাতে স্বজাতির ও স্বদেশের অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহার সংশোধনে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব ইতিহাস-পাঠ সকলের পক্ষেই সবিশেষ আবশ্যক।

রোম ও রোমকদিগের বৃত্তান্ত।

রোমনগরের স্থাপনাবধি শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে অন্তঃকরণে অতিশয় বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়। রোমনগর ইটালির অন্তঃপাতী। এই নগর প্রথমে অতি বিশাল ছিল না। ইহাতে প্রথমে যে সমস্ত লোক বসতি করে, তাহারাও অসামান্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি বুদ্ধি ও বাহুবলে ক্রমে ক্রমে ইটালির অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় প্রদেশের

আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের দিন দিন প্রভাব বৃদ্ধি দেখিয়া প্রতিবেশবাসীরা সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বিপক্ষগণ রোমকদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিবার যত চেষ্টা করিতে লাগিল ততই তাহাদিগের উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, বল এবং প্রতিভার প্রভা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঊর্দ্ধতন রোমকদিগের উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, লোভবিরহ এবং স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কতিপয় উদার গুণ দ্বারা প্রথমে রোমরাজ্যের আধিপত্য যেমন বহুদূর বিস্তারিত হইয়াছিল; তেমনি শেষে অধস্তন রোমকদিগের আলস্য, অনুৎসাহ, অর্থলালসা, ভীরুতা প্রভৃতি কতিপয় দোষ প্রবল হওয়াতে সেই বিশাল রোমরাজ্য এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। রোমরাজ্য, স্থাপনাবধি শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় সহস্র বৎসর কাল অখণ্ডিত ছিল। সহস্র বৎসর পরে অসভ্যজাতীয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলে।

রোমকদিগের রাজ্যশাসন-প্রণালী অতি চমৎকার ছিল। এমনি চমৎকার যে তাহারা নানা নগর এবং নানা জনপদ এক নগরের ন্যায় শাসনে ও স্ববশে রাখিয়াছিল। ঐরূপ অদ্ভুত রাজ্য-শাসন-প্রণালী ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না!

রোমকদিগের আর সে রাজ্যপদ নাই, সে প্রভাব নাই, সে মহত্ত্ব নাই। কিন্তু সেই মহত্ত্বচিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান

রহিয়াছে। ইটালি; স্পেন, পোর্টুগাল, ফ্রান্স, এই কয়েক দেশের ভাষার সহিত রোমকদিগের ভাষার ঐক্য করিলে রোমকদিগের মহত্ত্বের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমকদিগের ভাষা লাটিন ভাষা। লাটিন ভাষা রূপান্তরে পরিণত এবং ন্যূনাধিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ কয়েক দেশের ভাষা হইয়াছে। ইংরাজি ভাষাও সর্ব্বতোভাবে লাটিন-সম্পর্কশূন্য নহে। যেমন সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ লাটিন না জানিলে ঐ কয়েক ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ সম্ভাবিত নহে। সংস্কৃত যেমন বাঙ্গালা ভাষার, লাটিন তেমনি ঐ কয় ভাষার, মূল। রোমকেরা স্ববুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়া স্বদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সমস্ত নূতন নিয়মের সৃষ্টি করিয়া যায়, ইউরোপখণ্ডের অনেকস্থলেই সেই সকল নিয়ম দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। রোমকদিগের মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে, রোমকেরা অসাধারণ-বুদ্ধি-বলে যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সভ্যতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অধুনা ইউরোপখণ্ডে বিরাজমান হইতেছে। ফলতঃ ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই বোধ হইবে যে, ইংরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান জাতি অধুনা যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রোমকদিগের সভ্যতা তাহার বীজস্বরূপ।

যে জাতি প্রথমে অতি সামান্য ও অগণ্য থাকিয়াও নিজগুণে এবং বুদ্ধিবলে তৎকালপরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায়

সর্ব্বস্থলেই স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল; যে জাতি স্ববুদ্ধি-কল্পিত অদ্ভুত রাজ্য-শাসন-প্রণালীদ্বারা নানা নগরে এবং নানা জনপদে বিভিন্নস্বভাব লোকদিগকে এক নগরের লোকের ন্যায় স্ববশে রাখিয়া সহস্র বৎসর কাল দুর্ব্বহ রাজ্য-ভার অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছিল; যে জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ করিয়া, শত শত লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল; যে জাতির সভ্যতামূল হইতে শত শত সভ্যতালতা বিনির্গত হইয়া অধুনা ইউরোপখণ্ডের নানা প্রদেশে শোভমান হইতেছে; সেই জাতির পূবাবৃত্ত পাঠ করিলে যে, শত শত -উপকার লাভ হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

রোমকদিগের রাজা।

অস্মদেশীয় গ্রন্থকারেরা বর্ণন করিয়াছেন, রাজা দেবতা-স্বরূপ; রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। অস্মদ্দেশীয়েরা গ্রন্থকারদিগের এই বাক্য প্রমাণ করিয়া রাজাকে যেরূপ দিক্‌পালের অংশসম্ভূত নররূপ দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করিত; রাজা বালক, অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহাকে যেরূপ পৈতৃক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিত, এবং রাজা দুরাচার ও নৃশংস হইলে যেরূপ তাহার অসহ্য অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করিত; রোমকেরা রাজাকে সেরূপ দেবতা-স্বরূপ

জ্ঞান করিত না; পূর্ব্ব রাজার পুত্রদিগকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে রাজাসনে সন্নিবেশিত করিত না; এবং রাজা অত্যাচারী হইলে কোন ক্রমেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিত না।

ফলতঃ আমাদিগের দেশে রাজার বিষয়ে ও রাজনিয়োগ বিষয়ে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, রোমে সে প্রকার প্রথা ছিল না। রোমকেরা যাহাকে মনোমত ও উপযুক্ত বোধ কবিত, তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিত এবং রাজা দুরাত্মা হইলে তাহার রাজ্যশাসন-পরিত্যাগে যত্নবান্ হইত।

রোমনগরে রাজনিয়োগবিষয়ক যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রধান প্রাড়্বিবাক অপেক্ষা রোমীয় রাজার অধিক ক্ষমতা ছিল না। রাজার যে সকল ক্ষমতা ছিল, তিনি তৎসমুদায় প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক যদি সচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে রাজা ও রাজকীয় ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমুদায় লোক সৎ ও সৎপথাবলম্বী নহে; স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুষ্টলোকেরা শিষ্ট লোকের উপর অনায়াসে অত্যাচার ও বল প্রকাশ করে। প্রজাগণ পরস্পর সেই অত্যাচার নিবারণে উদ্যত হইলে মহতী অনর্থপরম্পরা এবং দেশ-মধ্যে ভূয়সী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত প্রজা-গণ ঐক্যবাক্যে কোন প্রধানতম ব্যক্তির উপর আপনা-দিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে

আপনাদিগের সমুদায় ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপে প্রথমে রাজপদের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ঐ পদ কোন কোন দেশে অতিশয় পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রথমে যে যুক্তিতে রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সে যুক্তি ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে সেই সেই দেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সমুদায়ই রাজার; প্রজাগণ যাহা কিছু ভোগ করে, তৎসমুদায় রাজপ্রসাদলব্ধ। সুতরাং রাজাও তত্তদ্দেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। কিন্তু রোমকেরা রাজাকে সেরূপ জ্ঞান না করিয়া আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচনা করিত, এবং রাজা উপরত হইলে স্বদত্ত সমুদায় ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিত।

রোমের রাজা পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে প্রজাগণের নিকট হইতে রাজশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে প্রধান সেনাপতির, ব্যবহার-দর্শনকালে প্রধান প্রাড়্বিবাকের, এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রামচন্দ্র বনগমন করিলে তাঁহাকে আনয়নার্থ ভরতের চিত্রকূটপর্ব্বতে গমন।

ভরত রথারোহণপূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত অমাত্য সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের উদ্দেশে বনপ্রদেশে চলিলেন। সুমন্ত্র পূর্ব্বপরিচিত পথে রথচালনা করিতে লাগিলেন। ভরতের মনোরথের ন্যায় রথ অবিলম্বে গ্রাম, নগর, জনপদ অতিক্রম করিয়া, তৎপরে শৃঙ্গবেরপুরে প্রবিষ্ট হইল। ভরত রথ

হইতে অবরোহণ করিয়া গুহকমুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্ত-চিত্তে শ্রবণ করিয়া এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া স্মমনীভূত হইলেন। এবং গুহকের অনুরোধ-ক্রমে তদ্দিন তথায় যাপন করিলেন। পর দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গুহকসহ গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির তপোবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তপোধনমুখে শ্রীরামের প্রস্থানপদবী পরিচিত হইয়া চিত্রকূটগিরি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সঙ্গিগণ ক্রমশঃ অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনুযায়িলোক শ্রীরামদর্শন লালসায় এত অধিক আসিয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী ভাগ রাজধানীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে নির্জন বন জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে রামচন্দ্র, গজবৃংহিত, অশ্বহেষিত এবং সৈন্য ঘোষিত শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণেরে বলিলেন, বৎস! তুমুল কলরব শুনা যাইতেছে, হরিণ সকল ত্রাসিত হইয়া প্লুতগমন করি-তেছে; বিহগগণ গগনমণ্ডলে গোলাকারে বিচরণ করিতেছে; অতএব বোধ হয়, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে অটবীতে উপস্থিত হইতেছে। অতএব দেখ, ইহারা কোন্ দিকে আইসে। লক্ষ্মণ আদেশমাত্র বিশাল শালতরু আরো-হণ করিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সেনা বায়ুচালিত কাদম্বিনীর ন্যায় মহাবেগে দক্ষিণ দিকে

ধাবমান হইতেছে। দেখিবামাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক অরণ্যপরিসরে অগ্রসর হউন; বোধ হয় কৈকেয়ীকুমার ভরত রাজ্যাভিষেকে মত্ত হইয়া সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে হনন করিতে আসিতেছে। তাহারই সেনাকোলাহল শুনা যাইতেছে। অপকারী দুরাচারী ভরতেরে রণশায়ী করিয়া কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব। আততায়ী দুরাত্মার বধ করিলে অধর্ম্ম হইবে না। এই বলিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর বেপমানা জনকতনয়াকে বনান্তরালে লুক্কায়িত রাখিতে ধাবমান হইলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কোপোন্মুখ মুখবিকার বিলোকন করিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন, বৎস! ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, যে, তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ। অসি বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণাধিক ভরত উপস্থিত হইলে তাহার উপর কি অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে? সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে অরণ্যে আসিয়াছি; আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ জন্য রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য সুখ কাহাকে ভোগ করাইব? সৈন্যেরাও ত বলবিন্যাস বা ব্যূহরচনা করিয়া আসিতেছে না যে, তাহাদিগকে আক্রমণকারী বোধ করিতেছ। ভরতও খড়্গহস্ত হইয়া তোমার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছে না যে তাহাকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়া হিংসার উপক্রম করিতেছ। আততায়ী

হইলেই কি কেহ ভ্রাতৃবধ করিয়া থাকে? আপনার প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে পারা যায়? আমার বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে আগত হইয়া আমাদিগকে না দেখিয়া পর্য্যাকুল হইয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য আসিতেছে। যদি তোমার রাজ্যে অভিলাষ হয়, তবে ভরতেরে বলিয়া দিব, সে তোমারে রাজ্য অর্পণ করিবে। আর যদি ক্লেশ সহ্য করিতে না পার, তবে এই সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাও। আমি সীতাসহচর হইয়া সচ্ছন্দে কানন পর্য্যটন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ ভ্রাতার কথা শুনিয়া লজ্জাবনতমুখে এক দিকে দণ্ডায়-মান রহিলেন।

এ দিকে ভরত সেনাপতিদিগকে শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন; এবং স্বয়ং কতিপয়মাত্র বনেচর সহচর লইয়া গুহক সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে বলিলেন, বৎস শত্রুঘ্ন! যাবৎ রামচন্দ্রের রাজীব-লোচন, লক্ষ্মণের কোমল বদন বিলোকন করিতে না পারিব, যাবৎ অগ্রজের রাজলক্ষণলাঞ্ছিত চারু চরণ মস্তকে ধারণ করিতে না পারিব, যাবৎ জ্যেষ্ঠ মহাশয়কে রাজসিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া চামরগ্রাহী না হইতে পারিব, যাবৎ জনকনন্দিনীকে স্বীয় প্রভুর রত্নাসনশোভিনী না দেখিতে পাইব, তাবৎ আমার হৃদয়ের মর্ম্মবেদনার লাঘব ও শান্তি হইবে না। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পরিশেষে চিত্রকূটপর্ব্বতের এক পার্শ্বে রামচন্দ্রের আশ্রমের অনলোদ্গত ধূমশিখা অবলোকন করিলেন।

যেরূপ অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হইলে এবং ঘনান্ধকারে দীপশিখা দর্শন করিলে আনন্দোদয় হয়, রামচন্দ্রের পবিত্র পাবকের উর্দ্ধোত্থিত ধূমরাশি দর্শন করিয়া ভরতের চির-দুঃখিতান্তঃকরণে সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দুর্গম পথ অতি পরিষ্কৃত বোধ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পর্ণকুটীরের পর্য্যন্তভাগে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন শীতত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে মৃগমহিষের করীষরাশি সঞ্চিত, কুশ ও কুসুম পরিক্ষিপ্ত, পূর্ব্বোত্তরপ্রবণা বেদি, প্রদীপ্ত পাবক, বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ সৈকততট, পত্রাচ্ছাদিত বিশাল পর্ণ-শালা-দ্বয়, মনোরম হইয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে মন্দা-কিনীপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কৈলাস-গিরিতটে জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময় বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সতত প্রকৃতিপুঞ্জে এবং সজ্জনসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া উপা-সিত হইতেন, তিনি আজি বনবরাহ-মৃগকুল-পরিবৃত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি মহামূল্য পরি-চ্ছদ পরিধান করিয়া রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তিনিই আজি হরিণাজিনে কথঞ্চিৎ লজ্জাসংবরণ করিয়া অনাস্তৃত ভূমিতে বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন। যিনি উত্তমাঙ্গে সুন্দর কুসুমমালা ধারণ করিতেন, তিনিই আজি কদাকার জটাভার বহন করিতেছেন। যাঁহার দূর্ব্বাদলশ্যাম নির্ম্মল তনু অগুরুচন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাঁহার সেই শরীর অজি মলীমসক্লিন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমার অগ্রজ আমার জন্যে এত দুঃখ পাইতেছেন, ধিক্ আমার জীবনে,

ধিক্ জননীর অনিষ্টকারিণী প্রার্থনায়। অগ্রজের এত কষ্ট! এই বলিয়া বাষ্পবারি বিমোচন করিতে করিতে রামচন্দ্রের পাদমূলে শত্রুঘ্নের সহিত উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক আর্য্য! এই কথা বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা নিতান্ত শিশু, দুর্গম অরণ্যে তোমাদের আবশ্যকতা কি? ভরত বদ্ধাঞ্জলি-পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, আর্য্য! জননীর কুলাচার-বিরুদ্ধ প্রার্থনা অন্যথাভাব করিয়া রাজ্যভার স্বীকারপূর্ব্বক আমাদের প্রতিপালন ও দুরপনেয় কলঙ্ক অপনয়ন করুন, নতুবা নিন্দাস্পদ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া ভ্রাতার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রু জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

রামচন্দ্র সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বৎস! অকারণে জননীকে দোষারোপ করি ও না। মাতৃনিন্দা করিলে নিরয় গমন করিতে হয়, উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে, তুমি ও কথা আর মুখে আনিও না; আব আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্য-ভার গ্রহণ করা হইবে না। পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়াছি, তাহা প্রতিপালন না করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। ধর্ম্মসঞ্চয় সার জানিয়া সত্যধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি, তাহা সঞ্চয় করিতে পারি নাই, এবং সত্যব্রতের উদযাপনও হয় নাই, আমি কোন ক্রমেই পিতার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে পারিব না, যেরূপে পারি পিতার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আর তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছে তদনুসারে তুমি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন কর, কদাচ

পিতার কথা অন্যথাচরণ করিও না। করিলে, অধর্ম্ম হইবে।

ভরত বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিলেন, আর্য্য! আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, এই আমাদের কুলধর্ম্ম; আপনি কুলক্রমাগত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হউন; আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া কার্য্য করি। পিতার মৃত্যু হইলেই অগ্রজ সমগ্র ভার ধারণ করেন; কনিষ্ঠেরা কোন কর্ম্মের নয়; তাহারা না গৃহকর্ম্মেই তৎপর, না উপার্জ্জনক্ষম; কেবল বিলাসিতা প্রকাশ করিতেই ভালবাসে। যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, তাহারা অগ্রজের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; রাজ্য পালন করিতে প্রভূত বিদ্যাবত্তা ও যথেষ্ট ক্ষমতার আবশ্যকতা, আপনি কেন এ দুর্ভর ভার অযোগ্যের উপর অর্পণ করিতেছেন? যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহার উপর সেই কর্ম্মের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজ্যশাসন প্রভূতবিদ্যা-বুদ্ধি ও অসাধারণ বিচারশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার কার্য্য। যে আপনার ভার অপনি ধারণ করিতে অক্ষম, সে পৃথিবীব ভার ধারণ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই পারে না। আপনি সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত, স্বয়ং সকল বিষয়ের সমাধান করিতে তৎপর; অতএব বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করুন; আমার যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে আপনার প্রতিনিধি হইয়া বনে বাস করা আমার পক্ষে সহজ ব্যাপার; ইহাতে অসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনা আবশ্যক করে না; যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল দ্বারা উদর পূর্ত্তি করা যায়; অন্যের আহারের জন্য ভাবিতে হয় না। আমি কুলগুরু প্রভৃতি গুরু

জনের সম্মুখে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, রাজ্যপালন অপেক্ষায় বনে বাস আমার স্পৃহণীয় ও সুসাধ্য; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া মাতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; কোন রূপেই পাপরাজ্যে গমন করিব না।

রামচন্দ্র অশেষপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন বালকের মত কথা কহিতেছ? সন্তান হইয়া পিতাকে পতিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ; এরূপ বালকবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অভিষিক্ত হও। মন্ত্রীদিগের সহায়তা এবং কুলগুরুর প্রাড়্বিবাকীয় ক্ষমতা অবলম্বন করিয়া সুবিচার বিতরণ কর; সাহসেরে প্রধান সহায় করিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন কর। হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিয়া জননীবর্গের সেবা শুশ্রূষা কর। কালবিলম্ব করিও না, এক দিন রাজকার্য্য না দেখিলে অনেক অনর্থ ঘটে। আমি সত্যব্রত সমাপন না করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, বারংবার অনুরোধ করিলে অসন্তুষ্ট হইব অথবা অকর্ম্মণ্য জীবন পরিত্যাগ করিব।

বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত।

মহাভারত অতিবৃহৎ গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা পুরাণ এবং পঞ্চম বেদ শব্দেও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারতে পুরাণের

সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান আছে, এবং স্থানে স্থানে বেদের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেবচরিত ঋষিচরিত রাজচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নানাপ্রকার উপাখ্যানাদিও লিখিত আছে। অতিবিস্তৃত মহাভারত গ্রন্থে অনেক প্রকার রাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতি উক্ত হইয়াছে, এবং নানাবিধ লৌকিকা-চার ও বিষয়-ব্যবহারও বর্ণিত আছে। যাহাতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ কোন প্রকৃত পুরাবৃত্ত-গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে সে ক্ষোভ অনেক অংশে দূর হইতে পারে। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশের পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়া থাকে, মহাভারত তদ্রূপ প্রথাক্রমে রচিত নহে; কিন্তু কোন বিচক্ষণ লোকে মনোযোগপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম ও বিষয়-ব্যবহারের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিলে মহাভারত যেমন পুরাবৃত্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সেইরূপ কোন কোন অংশে ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলিলেও বলা যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেক প্রকার নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং কেবল নীতি উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের রচনাকর্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় অপরাপর পূর্ব্বতন ঋষিগণ উল্লিখিত অসামান্য গ্রন্থের অধ্যয়ন ও শ্রবণের যে সমস্ত অসাধারণ অলৌকিক-ফল-শ্রুতি বর্ণন

করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আস্থাশূন্য হইলেও ইহার শ্রবণ ও অধ্যয়ন দ্বারা নীতি জ্ঞান ও বিষয়-ব্যবহার জ্ঞানাদি অনেক-প্রকার উপকার লাভ করিয়া সুখী হওয়া যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতিশাস্ত্র রচনা দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ভারত-বর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান অবলম্বন-পূর্ব্বক অনুপম আশ্চর্য্য কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়া কাব্য-রসরসিক জনগণের চিত্তবিনোদ সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণও উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সর্ব্বদা শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে নীতি শিক্ষা প্রদান করেন। ফলতঃ ভারতান্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকে অনেকপ্রকার নীতি জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতিবিস্তীর্ণ ভারত গ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকলপ্রকার অবস্থাই বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকে সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থ এ দেশের গৌরব স্বরূপ। কোন ভিন্নদেশীয় পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, অসামান্য রচনানৈপুণ্য, প্রগাঢ় ভাব-মাধুরী ও উদার উদ্দেশ্যের যশঃ কীর্ত্তন করেন সন্দেহ নাই।

অসামান্য-যত্ন-সম্পন্ন ভারত গ্রন্থ যে কোন্ সময় ও ভারত-বর্ষের কিপ্রকার অবস্থায় রচিত হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য

হইয়া অবধারিত করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু বেদরচনার অনেক পরে যে ইহার রচনা হইয়াছে তাহা ইহার রচনা-তাৎপর্য্য ও উপাখ্যানাদি দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদের ভাষার সহিত ইহার ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহাকে বেদাপেক্ষা আধুনিক বোধ হয়, এবং ইহার মধ্যে বেদের আখ্যানাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, লোকযাত্রা-বিধান, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও শিল্পশাস্ত্রাদি-সংক্রান্ত যে সকল কথা বর্ণিত আছে, কোন আদিম কালবর্ত্তী অসভ্যাবস্থ লোকের চিন্তাপথে তৎসমুদায় উদিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সময় ভারতবর্ষে বিলক্ষণরূপে সভ্যতার প্রচার ও জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছিল, মহাভারত যে তৎকালের রচিত গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

অশেষজ্ঞানাধার ও নীতিগর্ভ মহাভারত গ্রন্থ এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের বোধসুলভ করিবার উদ্দেশে কাশীরাম দাস তাহার অষ্টাদশ পর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশীরাম দাসের অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠ অথবা বেদীস্থিত পৌরাণিকদিগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাভারত যে কি পদার্থ ইহা যথার্থরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। কাশীরাম দাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-সম্পাদন-মানসে এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহির্ভূত অনেক কথা রচনা করিয়া

আপনার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইদানীন্তন পুরাণবক্তা পণ্ডিত মহাশয়েরাও শ্রোতাদিগের শ্রবণসুখসম্পাদনাভিলাষে এবং আপনাদিগের হাস্যকরুণাদি- রসসাধনী শক্তি প্রকাশ করিবার মানসে কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বকও অনেকপ্রকার নূতন কথার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতাদিগের শ্রবণের অনুপযুক্ত আশঙ্কা করিয়া মূল গ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় সর্ব্ব-সাধারণ লোকে মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লিখিত উভয় পথে যখন উক্তপ্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া স্বয়ং মহাভারত পাঠ বা কোন যোগ্য পণ্ডিতের মুখে প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ না করিলে আর মহাভারত যে কি ইহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এক্ষণে এদেশে দিন দিন সংস্কৃত ভাষার যে প্রকার অনমুশীলন এবং অনাদর হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বরং সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ক্রমে এদেশীয় লোকের নিকট হইতে তিরোহিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। সুদূরপ্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে, এবং পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমে নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে।

মহাভারতীয় কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্‌গণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখ নিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি, অতএব ভারত কথনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে। হে মহারাজ! রাজ্যলোভ প্রযুক্ত কুরু-পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্ব ভূতবিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্য বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকাল-মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতি লাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়াপরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রূরকর্ম্মা কর্ণ, ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইহাঁরা ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অন্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে

উপভোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমত সময়ে দুর্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান; তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যানুসারে বারণাবতে জতুগৃহ প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহবাসে আদেশ দিলেন। তাঁহারা এক বৎসর কাল তথায় নির্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্ম্মাণ

করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত-মনে রজনীযোগে জননীসমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যাদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্ম প্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে ভীমসেন হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ঘটোৎকচ-নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবব বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়া পঞ্চালদেশে আগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদী লাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চ পাণ্ডবকে কহিলেন, তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না। অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-রথ্যাকলাপমণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে

বহুমূল্যরত্নরাশি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণসমভিব্যাহারে খাণ্ডব-প্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রুদমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, অর্জ্জুন উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্ ও সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চ পাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতি লাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেবসমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর, ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরম

রমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময়নির্ম্মিত সভার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বকীয় ধন সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহা-দিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুল পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষে যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিনবিধূনন-পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহি-লেন, কেহ হর্ষিত হইলেন, এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন,

একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কি রূপে কৃতকার্য্য হইবে। এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিম্বা বিপ্রস্বভাব-সুলভ প্রলোভ-চপলতা প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃত-কার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না, এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবি-চলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কথনই বিফল প্রযত্ন হইবেন না। ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহ-শীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহা-দিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎ কর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ সুখজনক, দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ! জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন,

অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন ; অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য, ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু সজ্জ করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক পাঁচটী শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্র দ্বারা সেই অতিকষ্টবেধ্য লক্ষ বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, বাদ্যকরেরা শতাঙ্গতূর্য্য বাদন করিতে লাগিল, এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণা

লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্য-দান ও শুভ্র বসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্তমালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ।

যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পানিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ বলরাম ঘৃনিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিনী দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত

নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত বাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে অর্পণ করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনাব পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছেন, তখন আমি জয়েব আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজন-বহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশবীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তথন আর জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসঙ্খ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট-কলেবর শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তথন আর জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তথন আব আমি জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তথন আর জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তথন আমি জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথ বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তথন আর জয়াশা করি নাই।

যথন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক

ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই ।

যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই ।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই ।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই ।

সমুদ্র-মন্থন ।

পূর্ব্বকালে কোন সময় শঙ্করের অংশসম্ভূত মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন । একদা তিনি (পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে) এক বিদ্যাধরী হস্তে এক ছড়া অপূর্ব্ব দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন । ঐ মালা কল্পবৃক্ষের কুসুমদ্বারা গ্রথিত । উহার গন্ধে অখিল বন সুবাসিত হওয়াতে বনচারীদিগের অতীব মনোরঞ্জক হইয়াছিল । অনন্তর উন্মত্তব্রতধারী দুর্ব্বাসা পরমরমণীয় সেই মালা সন্দর্শন

করিয়া নিরুপমরূপবতী বিদ্যাধরীর নিকট তাহা যাচ্ঞা করিলেন। তন্বী বিশালনয়না বিদ্যাধরাঙ্গনা দুর্ব্বাসাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সমাদরপূর্ব্বক সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করিল। উন্মত্তব্রতধারী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা সেই মালা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি দেখিলেন, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র মত্ত ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন। তখন তিনি আপনার মস্তক হইতে সেই অপূর্ব্ব মাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ভ্রমরগণও উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মাল্যসহ ধাবমান হইল। অমররাজ সেই মাল্য গ্রহণ করিয়া ঐরাবত-মস্তকে স্থাপন করাতে তাহা কৈলাশ-শিখরস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধ ঐরাবত, অপূর্ব্ব সৌগন্ধ দ্বারা আকৃষ্টচেতা হইয়া করদ্বারা আঘ্রাণপূর্ব্বক তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ মহর্ষি দুর্ব্বাসা তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছ; কারণ তুমি লক্ষ্মীর আধার মদ্দত্ত এই মাল্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে। তুমি আমার নিকট মাল্য পাইয়া ভূমিস্থ হইয়া প্রণাম করিলে না এবং বলিলে না যে, 'আপনার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম।' অথবা তুমি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মদ্দত্ত বলিয়া ইহা মস্তকেও ধারণ করিলে না। মূঢ়! তুমি আমার দত্ত এই মালার প্রতি অনাস্থা

করিলে এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে। শক্র! তুমি সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অন্যান্য সামান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছ, এবং ইহাতে আমার প্রতি তোমার বিলক্ষণ অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। তুমি আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত মাল্য মহীতলে নিক্ষেপ করিলে, এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী ত্যাগ হইবে। দেবরাজ! যাঁহার ক্রোধোদয় হইলে স্থাবর জঙ্গম সকলেই ভয়বিহ্বল হয়, তাদৃশ আমাকে তুমি অত্যন্ত অহঙ্কারবশতঃ অবজ্ঞা করিলে।

পরাশর কহিলেন, অনন্তর যখন মহেন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহার অপরাধেই দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছেন; তখন তিনি ত্বরান্বিত হইয়া ঐরাবত-স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, প্রণিপাতপূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতি মিনতি করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে কহিলেন, পুরন্দর! আমি অন্যান্য মুনির ন্যায় কৃপালুহৃদয় নহি; ক্ষমা করা আমার রীতি নহে; আমার নাম দুর্ব্বাসা। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, যখন আমার মুখ ভ্রুকুটীদ্বারা কুটিল ও জটাকলাপ অগ্নিশিখা সদৃশ হয়, তখন তাহা দেখিয়া যে ভীত না হয়, এরূপ ব্যক্তি ত্রিভুবনে কে আছে? শতক্রতো! অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে কোন মতেই ক্ষমা করিব না; তুমি কিজন্য ভূয়োভূয়ঃ অনুনয় বিনয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছ।

দুর্ব্বাসা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দেবরাজও সেই ঐরাবতে পুনর্ব্বার আরোহণপূর্ব্বক অমরপুরীতে উপ-

নীত হইলেন। সেই অবধি ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুবন শ্রীভ্রষ্ট ও নষ্টপ্রায় হইল। যজ্ঞসাধন ওষধি লতাসমূহ দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। অতঃপর যজ্ঞ আর অনুষ্ঠিত হয় না, তপস্বীরাও তপস্যা করেন না, লোক দানাদি ধর্ম্মেও মনোনিবেশ করে না।

ত্রিলোক এইরূপ সত্ত্ববিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইলে দৈত্য ও দানবগণ, দেবগণের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, দৈত্যদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পরাপর জগতের ঈশ্বর অসুরসংহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দেবগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় দেবগণের সমভিব্যাহারে বহুবিধ ইষ্ট বাক্য দ্বারা পরাপর জগতের অধীশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু এইরূপে স্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর দেবগণ, নিরুপমরূপসম্পন্ন উর্জ্জিত তেজোরাশি স্বরূপ শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া পূর্ব্বে কৃতপ্রণাম হইলেও বিস্ময়ে স্তিমিত-নেত্র হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং

পিতামহের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতারা কহিলেন, হে দেব! তুমি শুদ্ধ, অর্থাৎ নির্লিপ্ত পরমাত্মা, তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি।

অমরগণ প্রণত হইয়া স্তব করিলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ হরি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! আমি তোমাদের তেজোবৃদ্ধি করিয়া দিতেছি এবং যাহা বলিতেছি তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর। দেবগণ! তোমরা দৈত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় ওষধি আনয়নপূর্ব্বক ক্ষীরসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে, পরে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে নেত্র অর্থাৎ মন্থন-রজ্জু করিয়া অমৃতমন্থন অর্থাৎ মন্থন দ্বারা অমৃত উৎপাদন করিবে, এই কার্য্যে আমি তোমাদের সহায়তা করিব।

অনন্তর দেবদেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে, দেবতারা অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং অমৃত উৎপাদনের জন্য যত্নবান হইলেন। দেবতা, দৈত্য ও দানবগণ নানাবিধ ওষধি সমানয়নপূর্ব্বক শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুদ্রের সলিলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া বেগদ্বারা অমৃত মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে সমুদয় দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন, সুতরাং অসুরগণ বাসুকির মুখের দিক্ ধারণ করিল। অসুরগণ, বাসুকির ফণনিঃসৃত নিশ্বাসবহ্নি-দ্বারা কান্তিশূন্য ও নিস্তেজ হইতে লাগিল। বাসুকির ঐ নিশ্বাসবায়ুদ্বারা মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইয়া তাহার পুচ্ছ-

দেশে বর্ষণ করাতে দেবগণ আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরমধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতের আধার হইলেন। চক্রগদাধর বিষ্ণু, এক মূর্ত্তি দ্বারা সুরগণমধ্যে ও অপর মূর্ত্তি দ্বারা অসুরগণমধ্যে থাকিয়া বাসুকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু অন্য একটী বিরাটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উপরি হইতে উক্ত পর্ব্বত আকর্ষণ করিয়া থাকিলেন; কিন্তু এ মূর্ত্তি সুরাসুরের কেহই দেখিতে পাইলেন না। বিভু বিষ্ণু একপ্রকার তেজোদ্বারা নাগরাজকে এবং অন্যবিধ তেজোদ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীর সমুদ্র মথ্যমান হইলে, প্রথমতঃ ঘৃত দুগ্ধাদির আধার স্বরূপ সুরভি নামে কামধেনু উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন। অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ পরম আহ্লাদিত ও লোভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সেই সুরভিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। আকাশপথে সিদ্ধগণ, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই কথা বলিয়া (সুরভির উৎপত্তির বিষয়) চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে, বারুণীদেবী উৎপন্ন হইলেন। মদদ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর ক্ষীরোদ-সাগরে একটা মহা আবর্ত্ত উঠিল এবং তাহা হইতে দেবস্ত্রীদিগের আনন্দদায়ক পারিজাত উৎপন্ন হইল। তৎকালে তাহার গন্ধে সমস্ত জগন্মণ্ডল আমোদিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পরম অদ্ভুতরূপগুণসম্পন্ন উদার স্বভাব অপ্সরোগণ সেই ক্ষীরোদ সাগর হইতে উত্থিত

হইল ; তদনন্তর হিমাংশু উৎপন্ন হইলেন ; মহেশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিষ উৎপন্ন হইলে সর্প প্রভৃতি তাহা অংশ করিয়া লইল। অনন্তর শুক্লবসনধারী দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তখন সুরগণ অসুরগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ ও সুস্থহৃদয় হইলেন। তৎপরে বিকসিত কমলে সমাসীনা কমল-ধারিণী নিরুপমরূপবতী ভগবতী কমলা, সেই ক্ষীরোদসাগর হইতে সমুত্থিতা হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মীসূক্ত অর্থাৎ "হিরণ্যবর্ণাম" ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিল। ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। গঙ্গা প্রভৃতি নদীগণ লক্ষ্মীর স্নানার্থ সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। এবং দিগ্‌গজ সকল হেমপাত্র-স্থিত সুবিমল সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোক-মহেশ্বরী সেই লক্ষ্মীকে স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ সমুদ্র স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে এক ছড়া পদ্মের মালা প্রদান করিলেন। ঐ পদ্ম কস্মিন্ কালেও ম্লান হইবার নহে। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাঁহার শরীর অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী স্নাতা ও বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া দিব্য বসন পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক সমুদায় দেবগণের সমক্ষে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিয়া দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেবগণও তৎক্ষণাৎ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাভাগ! বিষ্ণু-

ভক্তিপরাঙ্মুখ বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষ্মীকে বিমুখ দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইল। তখন তাহারা ধন্বন্তরির হস্তে কমণ্ডলু ও তাহা অমৃতপূর্ণ দেখিয়া মহাবীর্য্য-প্রভাবে বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল। অনন্তর বিষ্ণু মোহিনীস্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক মায়া দ্বারা দৈত্যগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন। দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারাও তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। দৈত্যগণ তখন নিস্ত্রিংশ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদেব প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা অমৃতপানপূর্ব্বক বলবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং দৈত্যসৈন্যগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ ও দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। অনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার অনুসারে দেবলোক শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাকর নির্ম্মলকিরণ হইয়া স্বীয় পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণও স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভগবান্ হুতাশন দীপ্তি বিস্তারপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্মে মতি হইল। তখন ত্রৈলোক্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ত্রিদশপ্রধান ত্রিদশনাথও পুনর্ব্বার শ্রীসম্পন্ন হইলেন। তিনি দেবলোক পুনঃপ্রাপ্ত ও দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কমলহস্তা ভগবতী কমলার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

লিস্‌বনের ভূমিকম্প ।

লিস্‌বন নগরে ১৭৫৫ অব্দের ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বাহ্লের ন্যায় মনোহর পূর্ব্বাহ্ণ আর কখনই নয়নগোচর হয় নাই। আকাশমণ্ডল সম্পূর্ণ স্থিরভাবাপন্ন ও নির্ম্মল; অংশুমালী অতি উজ্জ্বল প্রভায় অংশুজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। দুর্ঘটনার কোন লক্ষণই নাই; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এই সুবিস্তৃত জনপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর এককালে ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিল।

ঐ দিন বেলা নয় ঘটীকার পর, আমি একখান পত্র লিখিতেছিলাম, পত্র লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র সহসা আমার সম্মুখস্থ টেবিলটী বিলক্ষণ কম্পিত হইতে লাগিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। তৎকালে কিছুমাত্র বায়ুর সঞ্চার ছিল না; তবে কি কারণে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে আমার আবাসবাটীর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। আমি প্রথমে স্থির করিলাম যে, বাটীর পার্শ্বস্থ পথে যে সকল শকটশ্রেণী চালিত হইতেছে তাহাদেরই চক্রধ্বনি দ্বারা এরূপ কম্প উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দূরস্থবজ্রধ্বনি সদৃশ এক ভীষণ শব্দ ভূমির অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইতেছে। প্রায় তিন পল অতীত হইল, তথাপি উহার নিবৃত্তি হইল না। তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ।

অনন্তর হস্তস্থিত লেখনী টেবিলের উপর রাখিলাম। আমার সমুদায় শরীর চকিত হইয়া উঠিল। তখন আমি এই গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করি, কি বহির্গত হইয়া পথের দিকে ধাবমান হই এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে এক অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। উহাতে আমি এককালে নিস্তব্ধ হইলাম ভাবিলাম যেন, নগরস্থ যাবতীয় অট্টালিকাই যুগপৎ ভূমিসাৎ হইল। আমার আবাসবাটী এরূপ ভীষণ বেগে দোলায়িত হইতে লাগিল যে, প্রতিক্ষণেই উহার উপরিস্থ তলের অচিরপাতের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমি ঐ বাটীর সর্ব্বনিম্নস্থ তলে বাস করিতাম, স্থতরাং উহার তাদৃশ শীঘ্র পতনের শঙ্কা উপস্থিত হইল না। কিন্তু আমার গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রীই স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পদতল কোন ক্রমেই ভূতলে স্থিরভাবে রহিল না।

যখন গৃহের ভিত্তি সকল ভয়ানকভাবে ইতস্ততঃ দোলায়-মান হইতে লাগিল, যখন ভিত্তির অনেক স্থান বিদীর্ণ ও সেই সমস্ত বিদীর্ণ স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল স্খলিত হইতে লাগিল, যখন অধিকাংশ বরগার প্রান্তভাগ ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; তখন, এখনই আমায় চূর্ণীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেবল ইহাই স্থির করিলাম। ক্ষণকাল মধ্যে বিপর্য্যস্ত সৌধোত্থিত ধূলিরাশি নিবিড় ঘনঘটার ন্যায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দিগ্বলয় এরূপ অন্ধতমসে আবৃত হইল যে, আর কোন বস্তুই স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। ভূতল হইতে এত অধিক গন্ধকের বাষ্প

উঠিতে লাগিল যে, প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড কাল আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

কিয়ৎক্ষণপরে যখন ক্রমশঃ ভূমিকম্পের ভীষণতার অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ঘনতর তিমিররাশি অল্পে অল্পে বিরল হইয়া পড়িল, তখন দেখি যে ধূলিধূসরিত, ভয়বিবর্ণ ও কম্পিত কলেবর এক স্ত্রী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া আমার গৃহতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? কিরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? সে ভয়ে এমনই অভিভূত যে, আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিল না; কেবল অতি কাতর স্বরে কথঞ্চিৎ আমাকে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন, আজি কি পৃথিবীর প্রলয়-কাল উপস্থিত?" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! এ কি, আর যে নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না, তৃষ্ণায় হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়, যদি আপনি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রদান করেন তবেই রক্ষা।" তখন আমি জল কোথায় পাইব, সুতরাং তাহাকে কহিলাম, ইহা পিপাসাশান্তিচিন্তার সময় নহে; জীবনরক্ষার উপায় চিন্তনে তৎপর হও, এই বাটী আমাদের মস্তকে পতিত হইয়াছে বলিলেই হয়, দ্বিতীয় বার কম্প উপস্থিত হইলেই নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভূমধ্যে প্রোথিত করিবে, আইস এখান হইতে পলায়ন করি।

এই কথা বলিয়া আমি সত্বর সিড়ীর নীচে ধাবমান হইলাম। সেই ভয়বিহ্বল অবলাও আমার বাহু

অবলম্বন করিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। যে পথটী বাটী হইতে সরলভাবে টেগস নদীতীরে মিলিত হইয়াছে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি যে, রাশীকৃত পতিত গৃহের ভগ্নাবশেষে উহা একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরণে বিরত ও পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যাইতে যাইতে এক প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন আমায় আত্মরক্ষা অপেক্ষা সেই শিশুসন্তানধারিণী অবলার জীবন-রক্ষার্থে সমধিক যত্নশালী হইতে হইল। বহু কষ্টে তাহাকে স্তূপ অতিক্রম করাইলাম এবং পূর্ব্ববৎ সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ হইলাম, যে, যুগপৎ হস্ত ও পদ উভয়েরই সাহায্য ব্যতিরেকে উহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না। তখন আমি অনুযায়িনী স্ত্রীলোকটীকে কহিলাম, তোমাকে এই স্থানেই রুদ্ধ থাকিতে হইল, ইহা হইতে তোমার উদ্ধার সাধন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এই বলিয়া আমি অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম, সুতরাং সেই অবলাকে তথায় থাকিতে হইল। আমি হস্ত-দ্বয়-পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে একটা দোলায়মান ভিত্তি হইতে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড পতিত হইয়া ঐ দুর্ভাগ্য নারী ও তাহার শিশু সন্তান উভয়কেই চূর্ণীভূত করিল।

অনন্তর আমি এক সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ পথে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, উহার উভয় পার্শ্বস্থ সকল অট্টালিকাই চতুস্তল বা পঞ্চতল পরিমিত উন্নত; সমুদায়গুলিই অতি পুরাতন,

তন্মধ্যে অধিকাংশই পতিত দেখিলাম; কতকগুলি পতিত হইতে হইতে পথিকদিগের প্রতিপদেই মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতেছে; সম্মুখে অনেকগুলি পথিকের শব পতিত দেখিলাম; আহা! আর কতকগুলি পথিক এরূপ শোচনীয়ভাবে পিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষতশরীর হইয়াছে যে, তাহারা কোন ক্রমেই উপস্থিত সাক্ষাৎ কালান্তকের হস্ত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত এক পাও চলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক আত্মরক্ষাই প্রকৃতির প্রথম নিয়ম, সুতরাং আমি যথাশক্তি দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে সেণ্টপলের গির্জার সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত ভূভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একপ্রকার নিরাপদ হইলাম। আমার উপস্থিতির কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে গির্জাটী ভূতলশায়ী হইয়া বহুসংখ্যক জীবের জীবন সংহার করিয়াছে! আমি অল্প ক্ষণ মাত্র তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। নদীতীরই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া গির্জার পশ্চিমপার্শ্বস্থ রাশীকৃত ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ তটিনীতটে উত্তীর্ণ হইলাম; দেখিলাম, নানা-শ্রেণীস্থ অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ তথায় সমবেত হইয়াছে; সকলেরই মুখ মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ; প্রত্যেকেই জানুপাতপূর্ব্বক বক্ষস্তাড়ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

জীবিত-রক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া সকলেই এইরূপ কাতর ধ্বনি করিতেছে, এমন সময়ে দ্বিতীয় বার ভূকম্প আরম্ভ হইল। যদিও ঐ কম্প অপেক্ষাকৃত অল্প ভীষণভাবে আবি-

ভূ্ত হইল, তথাপি উহার আঘাত দ্বারা পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় দোলায়মান অট্টালিকাই এককালে উন্মূলিত হইয়া পড়িল; নগরের চতুর্দ্দিকেই করুণ কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ সময়েই আবার একটী পল্লীস্থ গির্জা পতিত হইয়া বহুসংখ্যক হতভাগ্যের অপমৃত্যু সাধন করিল। ঐ কম্পনের বেগ এরূপ তীব্র যে, কোনক্রমেই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকা যায় না।

ঐ সমুদ্রজল আসিতেছে, আর রক্ষা নাই, এখনই সকলকে বারিপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, হঠাৎ এইরূপ ভয়ঙ্কর কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি নদীকূলের যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তথায় স্বভাবতঃ নদীর বিস্তার প্রায় দুই ক্রোশ। ঐ সময়ে নদীর আকার দেখিয়া বোধ হইল যে, উহার জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুসঞ্চার ছিল না; অনতিদূরে দেখিতে পাইলাম, এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার তুঙ্গ সলিলরাশি ভীষণ শব্দ ও প্রভূত ফেনোদ্গরণ করিতে করিতে অতি তীব্র বেগে তীরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমরা সকলেই প্রাণপণে পলাইতে আরম্ভ করিলাম। অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতেই ঐ বারিপ্রবাহ আমাদিগের উপর পতিত হইল এবং ক্ষণমধ্যেই অনেক অনেক হতভাগ্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐরূপ বেগেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি ভাগ্যক্রমে একখানি কড়িকাষ্ঠ পাইয়াছিলাম। প্রবাহের আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে উহা আলিঙ্গন করিয়া অবশ্যম্ভব্য অপমৃত্যুর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলাম।

অনন্তর জল ও স্থল সর্ব্ব স্থানেই সমান বিপদ উপস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলাম এবং জীবন-রক্ষার্থ কোথায় যাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেণ্ট-পলের গির্জা-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে সত্বর প্রস্থান করিলাম। উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রহিলাম। দেখিলাম, সম্মুখবর্ত্তী নদীমধ্যে যাবতীয় পোত প্রচণ্ড বাত্যাহতের ন্যায় নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কতকগুলি পোত ছিন্নবন্ধন হইয়া নদীর অপর পারে ভাসিয়া যাইতেছে; কতকগুলি প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে; আর কতকগুলি বৃহৎ পোত এককালে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি পোতাধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম যে, যে সময়ে আমি পোতশ্রেণীর উক্তরূপ দুর্গতি দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে তথা হইতে প্রায় আধ পূয়া দূরে একটী নূতন প্রস্তরবদ্ধ সুদৃঢ় তীরভূমি এককালে জলসাৎ হইয়াছিল। নিরাপদ ভাবিয়া বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জলরূপী কালের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় নাই! ঐ সময়ে আরও কতকগুলি লোক জীবনরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত হতভাগ্য-জীব-পূর্ণ যাবতীয় নৌকাই ভীষণ আবর্ত্ত তুল্য প্রবল জলস্রোতে নিমগ্ন হয়। পোতাধ্যক্ষগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন যে, দ্বিতীয় কম্পন-কালে প্রথমোত্থিতবাত্যাহত

সমুদ্রের ন্যায় সমুদায় নগরটী এক এক বার পশ্চাৎ ও এক এক বার সম্মুখে চালিত হইয়াছিল এবং নদী গর্ভে ভূকম্পের এরূপ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল যে, যাবতীয় নোঙ্গর এককালে ভাসিয়া উঠিল, আর সেই সময়েই নদীর জল সহসা প্রায় ১৪।১৪ হাত স্ফীত হইয়া ক্ষণমধ্যে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল।

যে স্থানে উক্তরূপ ঘটনাগুলি উপস্থিত হয়, আমি অল্প দিন পরে তথায় যাইয়া দেখি যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে যে স্থানে পাদচারণ করিয়া পরম সুখানুভব করিয়াছিলাম, তাহার কিছু মাত্র চিহ্ন নাই। সমুদায় স্থানই জলময় হইয়াছে, বিশেষতঃ কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা এত অধিক যে তাহার পরিমাণ করাই দুঃসাধ্য।

আমার, সেণ্টপলের গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তৃতীয় বার ভূকম্প উপস্থিত হয়। ঐ কম্পন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কম্পন অপেক্ষা অতি অল্পই প্রবল বোধ হইল; তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে ঐ কম্পন দ্বারা সমুদ্রজল অতি তীব্র বেগে তীরে উত্থিত হইয়া ঐরূপেই অধঃপতিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল পোত সপ্তব্যাম-পরিমিত জলের উপরিভাগে ভাসমান ছিল, তৎসমুদায় এককালে শুষ্ক ভূমির উপর উত্থাপিত হয়।

পাঠকগণ! আপনারা এই যৎসামান্য প্রস্তাব পাঠ করিয়া উল্লিখিত সংহারদিনের যাবতীয় দুর্ঘটনার বর্ণনা শেষ হইল এমন মনে করিবেন না। বস্তুতঃ উক্ত দিনের সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিতে হইলে একখানি গ্রন্থ

লিখিতে হয়। যাহা হউক, আমরা আর একটী অতি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

উক্ত দিন প্রদোষ-কালে, বিরল তিমিরজাল যেমন অল্পে অল্পে দিগ্বলয় আবরণ করিল, অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। সমুদায় নগর এককালে অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি, ঐ আলোকে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ কবিতে পারা যাইত। দেখিতে দেখিতে নগরের শত স্থান হইতে যুগপৎ শত শত অগ্নিশিখা সমুত্থিত হইল। হতাবশিষ্ট হতভাগ্য নগরবাসীরা উপর্য্যুপরি আকস্মিক বিপৎপাত দর্শনে ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল যে উহার নির্ব্বাপণার্থ কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না। সুতরাং ঐ অব্যাহত হুতাশন ক্রমাগত ছয় দিবস কাল সমভাবে জ্বলিতে লাগিল। এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার বিরাম ছিল না। ঐ অনিবার্য্য অগ্নি ছয় দিন নগরের যাবতীয় পতিতাবশিষ্ট গৃহ সকল একবারে ভস্মীভূত করিল।

আমি প্রথমে মনে করিলাম, ভূকম্পকাল-সুলভ ভৌমাগ্নি উত্থিত হইয়াই এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, নবেম্বর মাসের প্রথম দিন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক অতি পুণ্য পর্ব্বাহ। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ যাবতীয় দেবালয়ে আলোক প্রদান করে; তন্মধ্যে একটী গির্জায় ২০টী দীপ প্রদত্ত হয়; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে তৃতীয় ভূকম্পন উপস্থিত

হইয়াছিল, তাহারই আঘাতে শোষোক্ত গির্জাস্থিত মশারি, যবনিকা, গবাক্ষ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে অগ্নি সংলগ্ন হয়; সুতরাং তৎসমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অনন্তর ঐ দহ্যমান দেবালয় হইতে প্রবলতর অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সন্নিহিত গৃহান্তরে সংলগ্ন হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় অট্টালিকাই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

উল্লিখিত ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ষষ্টি সহস্রেরও অধিক লোক দগ্ধ ও ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ভূকম্পন দ্বারা অতি বিস্তৃত সমৃদ্ধ লিস্‌বন নগর এককালে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। আহা! তখন আর তথায় ধনী ও দরিদ্রের কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না, যে সকল সম্পন্ন পরিবার এই দুর্ঘটনার পূর্ব্ব দিন পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন, পর দিনই সেই সকল পরিবারকে একেবারে প্রান্তরচারী হইতে হইয়াছিল, তখন তথায় এমন কেহই ছিল না যে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারে।

ইলোরার গুহা।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্যের প্রমাণার্থে অধুনা বাক্যব্যয় করিলে অনেকে পণ্ডশ্রম বোধ করিবেন; পরন্তু এক তমসাবৃত গৃহে বন্ধুদ্বয় সন্নিহিত থাকিলেও পরস্পর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষবিরহে তাহাদের সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদার্থ যেমন অবর্ত্তমানতুল্য হয়, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন দেশে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিও তাদৃশ বিফল হয়। মিশর দেশে

"পিরামিড" নামক যে কএক পঞ্চকোণাকার সমাধিস্থান আছে, তৎতুল্য বৃহৎ নির্ম্মাণ পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই; অথচ মিসর-দেশীয়েরা অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাবে তৎকর্ত্তৃদিগের নামও বিস্মৃত হইয়াছেন। দিল্লী নগরে কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা লৌহময় এক অদ্বিতীয় প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, এবং তদুপরি বিবিধ অক্ষর ক্ষোদিত আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে তাহাতে স্তম্ভকর্ত্তার বংশাবলী কিম্বা কোনরূপ শাসন ক্ষোদিত থাকিবেক; কিন্তু অধুনা কেহ ঐ অক্ষর পাঠ করিতে পারেন না, এবং ঐ স্তম্ভ কি নিমিত্তে ও কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার কোন বিবরণ প্রচারিত নাই। বেতিয়া, বাকরা, মগধ, কান্যকুব্জাদি অপর অনেক স্থানেও প্রস্তরময় তদ্রূপ জয়স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাদিগেরও বিবরণ লুপ্ত হইয়াছে। অপর ভারতবর্ষে অনেক স্থানে দেবভবন রাজভবনাদি আশ্চর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ অট্টালিকাদি বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় তৎপ্রণেতারা তাহার নির্ম্মাণসময়ে মনে প্রত্যাশা করিয়া থাকিবেন যে "যদ্যপি 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' এই বাক্য সত্য হয়, তবে আমাদিগের গুণগরিমা জনসমাজে অবশ্য চিরস্থায়ী হইবেক।" কিন্তু হায়! সে আশা কি বিফলা হইয়াছে! বর্ণনাতীত-উৎকট-পরিশ্রম-সাধনপূর্ব্বক শত শত রাজভাণ্ডারের সম্পত্তি-সহকারে যাঁহারা আপন যশোবর্ণনা চিরস্থায়ী-করণাভিপ্রায়ে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকারে 'কীর্ত্তি-সত্ত্বেও তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত

করিয়াছে। এই সকল কীর্ত্তির মধ্যে প্রয়াগ নগরের "ফিরোজ সাহের লাঠ" নামক স্তম্ভ,—দক্ষিণ দেশীয় মহাবালিপুর নগরের দেবভবন,—বোম্বাই দ্বীপসান্নিধ্যে সালসেট ও হস্তি দ্বীপস্থ প্রস্তরগুহা, ও মহারাষ্ট্র দেশের ইলোরা নগরের সান্নিধ্যে গিরিগুহা, সর্ব্বপ্রধান।

বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে ইলোরা নামে এক স্থান আছে; তাহা অধুনা সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট, এবং নির্ম্মনুষ্যপ্রায় হইয়াছে। পরন্তু ইহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি-ভগ্নপ্রাচীর ও উৎসন্ন অট্টালিকা-সমূহের চিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধ প্রকাণ্ড ও বহুজন-সমাকীর্ণ এক নগররূপে পরিগণিত ছিল। ইহার অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত আছে; তাহা নগরের নামেই বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যায়ত, কিন্তু উচ্চ নহে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাবয়বের মধ্যভাগাপেক্ষায় ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশঃ অবনত, কিন্তু কোন কোন স্থান প্রাচীরবৎ।

ইলোরা নগরের মনুষ্যেরা কহে, পূর্ব্বকালে "ইলিচপুর" নগরে ইলু নামে এক রাজা ছিলেন। দৌর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া কীটে সমাকীর্ণ হইলে তিনি ইলোরা-শৃঙ্গস্থ "শিবালয়সরোবর" নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন-মানসে যাত্রা করেন। ঐ তীর্থ প্রথমতঃ ষষ্টি-ধনু-পরিমিত ছিল; কিন্তু যমদেবের প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু তাহাকে গোষ্পদতুল্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইলু রাজা এই তীর্থের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগাহনের সম্ভাবনাবিরহে অগত্যা ঐ তীর্থোদকে এক বস্ত্র ভিজাইয়া আপন ক্ষত শরীর ধৌত করাতে বহুকালস্থায়ি

কদর্য্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হন; পরে আপন কৃতজ্ঞতা চির-স্মরণীয় করণাভিপ্রায়ে ইলোরা পর্ব্বত খনন করাইয়া, ঐ খনিত বিস্তীর্ণ গুহা সকলেতে বিবিধ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গল্প মিথ্যা কি সত্য তাহা অধুনা নিশ্চয় করা দুষ্কর। বোধ হয় ইহার অধিকাংশই অলীক, কারণ ঐ সকল গুহা-দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তৎসমুদায় সমকালে এক রাজার অনুজ্ঞায় নির্ম্মিত হয় নাই। জিন, বুদ্ধ ও হিন্দু, এই তিন পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি সকল গুহা-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব অনুমান হয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বীরা ক্রমে ক্রমে এই গুহা সকল নির্ম্মাণ করান, অথবা এই গুহাসমুদায় ক্ষোদিত করেন; পরে কালসহকারে বিভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদিগের হস্তগত হইয়া তদীয় দেবমূর্ত্তি ও চিহ্নে সুশোভিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, অধুনা গুহা সকল কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীনে নহে; প্রায় সকল অধিকারিগণ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। হায়! কি ক্ষোভের বিষয়, যে সকল মন্দির বা প্রাসাদ পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত শ্রম ও ব্যয় সহকারে নির্ম্মিত হইয়া বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে সুশোভিত ও শত শত ঐকান্তিক ভক্তের প্রার্থনা ও স্তুতিবাদে সতত প্রতিনাদিত ছিল, এবং যথায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে আগত শতসহস্র যাত্রীদিগের তুমুল সমারোহ হইত, এইক্ষণে তাহা চাম্‌চিকা ও বন্যপশুর আবাস হইয়াছে, এবং কদাপি তস্কর ভিন্ন প্রায় আর কেহই তাহার সন্নিকটেও গমন করে না।

লঙ্কাদ্বীপ।

বাল্মীকি ঋষির প্রসাদে লঙ্কা দ্বীপ ভুবনবিখ্যাত হইয়াছে; হিন্দুজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতারা রামায়ণের স্থললিত-আখ্যায়িকা-রসে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব আত্মীয়বর্গের নামাপেক্ষায় উক্ত দ্বীপের নাম সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। দশাননের রাজপাট, সীতার কারাগার, হনুমানের বিক্রমক্ষেত্র, শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থান ইত্যাদি যে কোন বাক্যে সিংহল দ্বীপের উল্লেখ করা যায়, তদ্দ্বারা অবিলম্বে সমস্ত রামায়ণের অপূর্ব্ব-কবিতা-লহরী মনোমধ্যে বিকসিতা হইয়া উঠে; এবং ঐ সকল কবিতা-বর্ণিত আখ্যায়িকা সমূহ হিন্দুমাত্রেই সুবিজ্ঞাত আছেন। পরন্তু সিংহল-দ্বীপের আধুনিকী অবস্থা এতদ্দেশে প্রচার নাই। অনেকে বোধ করেন তদ্দ্বীপ মনুষ্যের গম্য নহে; এবং তাহাতে জনগণের বসতি নাই। কেহ বা কহেন যে বিখ্যাত নব্য সিংহল দ্বীপ প্রাচীন লঙ্কা নহে, কারণ লঙ্কার পরিমাণ ও ভারতবর্ষ হইতে দূরতা বিষয়ক বিবরণ রামায়ণে যে প্রকার উক্ত আছে তাহা অধুনা সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু তাহা কবির অত্যুক্তি মাত্র বোধ করিলে সেই সংশয় দূর হইতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পরিমাণ ২৪০০০ জ্যোতিষি ক্রোশ; তাহার একাংশে লক্ষ-যোজন-বিস্তৃত সমুদ্র কোথায় প্রাপ্ত হইবেক? অপর নব্য সিংহল দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের-চিহ্ন আছে; তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত দ্বীপই প্রাচীন লঙ্কা বটে।

কোন সুচতুর কবি বর্ণন করিয়াছেন যে, লঙ্কা দ্বীপ ভারতবর্ষের মুকুটচ্ছিন্ন মুক্তা বিশেষ; ফলতঃ উক্ত দ্বীপের অবয়ব নোলক-নামক মুক্তার ন্যায় বটে। অপর মণি মুক্তাদি যে সকল উপাদেয় দ্রব্য এই স্থানে উৎপন্ন হয় তদ্দৃষ্টে ইহাকে ভারতবর্ষের মুকুটরূপে বর্ণনা করা অসঙ্গত বোধ হয়না। অধুনা এই দ্বীপের দুই শত সপ্ততি জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘতাপরিমাণ, এবং এক শত জ্যোতিষি ক্রোশ প্রস্থ; ইহার পরিধি ৭৫০ ক্রোশ, এবং চতুরস্র ২৪৬০০ ক্রোশ।

লঙ্কা সর্ব্বাংশ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইবাতে সুতরাং দ্বীপ শব্দবাচ্য হইয়াছে। ইহার সমুদ্রসন্নিকটস্থ ভূমি নিম্ন এবং সরল; কিন্তু মধ্যভাগ উচ্চ এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ঐ পর্ব্বত সকল ১৷৷০ জ্যোতিষি ক্রোশের ঊর্দ্ধ নহে; এবং তাহা হইতে মহাবলি গঙ্গা, বালু গঙ্গা, ইত্যাদি নদী সকল নিঃসৃত হইয়া দ্বীপের সর্ব্বত্র প্লাবন করে। ঐ প্লাবন ভূমিতে দারুচিনি, মরীচ, শুণ্ঠী, সাটিন কাষ্ঠ, আবলুস কাষ্ঠ, গুবাক, কাওয়া, ইক্ষু ইত্যাদি বিবিধ ব্যবহার্য্য বাণিজ্য দ্রব্য অনায়াসে ও সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়।

পরন্তু সিংহল দ্বীপের মধ্যভাগস্থ পর্ব্বতাপেক্ষায় "আদম-শিখর" নামা সমুদ্রতটস্থ এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদুপরি এক মনুষ্যপদচিহ্ন আছে; তাহা ৩৸৹ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১৸৹ হস্ত প্রস্থ। সিংহল-দ্বীপস্থ সকলেই এই চিহ্নটী বিশেষ মান্য করিয়া থাকে। তত্রত্য মুসলমানেরা কহে, তাহা-দিগের শাস্ত্রোক্ত আদি পুরুষ আদম এই স্থানে এক পদে দণ্ডায়-মান থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত ঐ

সময়ে প্রস্তরোপরি তাঁহার পদের চিহ্ন হয়। বৌদ্ধেরা কহে, বুদ্ধদেব ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে আগমন সময়ে প্রথমতঃ ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হন, এবং তাহা হইতেই তথায় ঐ চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য হিন্দুরা ও মলবার-দেশীয়েরা প্রচার করে যে, উহা ভগবান্ মহাদেবের পদচিহ্ন। সে যাহা হউক, এই চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেরই মান্য হওয়াতে আদম-শিখরে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় বাণিজ্যেরও বিস্তর সম্ভাবনা।

লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম "পালি"। সংস্কৃত নাটক গ্রন্থে যাহাকে "প্রাকৃত ভাষা" কহে, পালিভাষা তদ্রূপ। লঙ্কার আধুনিক ভাষা ঐ পালিভাষার অপভ্রংশ ; এবং তৈলঙ্গ যবনাদি ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে।

সিংহলদ্বীপস্থ লোকেরা স্বদেশীয় পুরাবৃত্ত ইতিহাসানুসন্ধানে যত্নশীল ; এবং মহাবংশ, রাজাবলী, রাজরত্নকরী ইত্যাদি নামক গ্রন্থে তাহাদের রাজবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে ৪২৩৯ বৎসর পূর্ব্বে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে বধ করেন ; কিন্তু উক্ত বৎসর-সংখ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহা অধুনা সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ইহাও উক্ত আছে যে ২৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব স্বয়ং লঙ্কাদ্বীপে গমন করত তথায় সুধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তাহার তিন বৎসর পরে পুনরায় তদর্থে তথায় গমন করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যু-সময়ে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম

বিজয় ও কনিষ্ঠের নাম সুমিত্র। বিজয় অত্যন্ত অসৎ ছিল। সর্ব্বদা দুর্দ্দান্ত সমবয়স্ক ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে প্রজাদিগের উপরি বিষম অত্যাচার করিত। প্রজারা ঐ জাল্মের দৌরাত্ম্যে জর্জ্জর হইয়া রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া অগত্যা আপন দুষ্ট সন্তানকে দেশ-বহিষ্কৃত করণপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিলেন। দুরাত্মা বিজয় আত্মসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ সপ্তশত সমবয়স্ক সহ পোতারোহণে সমুদ্রে গমন করত অবশেষে সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। তথায় সে কুবাণী নাম্নী এক রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎকাল শিষ্টের ন্যায় কালযাপন করে। কিন্তু স্বাভাবিক দুষ্ট কতকাল ছদ্মবেশে শিষ্ট থাকিতে পারে? বিজয় কুবাণীর নিকট রাজ্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহার সহধর্ম্মিণীও তদর্থে উদ্যোগিনী হইল। এমত সময়ে একদা এক রাজবিবাহের সমারোহ হয়; তাহাতে দেশীয় সমস্ত প্রধান লোক একত্র হইয়াছিলেন; বিজয় সমভিব্যাহারীদিগের সঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিল, ইত্যবকাশে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করণের সদুপায় দেখিয়া মহানিশা সময়ে সঙ্গীদিগের সাহায্যে অনায়াসে রাজা প্রভৃতি সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইল। অতঃপর সে অষ্টত্রিংশৎ বৎসর কাল ক্রমাগত পরমসুখে রাজ্যভোগ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু সময়ে অপুত্রক প্রযুক্ত পিতাকে এতদর্থে পত্র লেখে যে "আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহলরাজ্য-গ্রহণার্থে প্রেরণ করুন।"

বঙ্গদেশে পত্রাগমন-সময়ে সিংহবাহুর মৃত্যু হইয়াছিল,

অতএব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র এই ভূ।নপত্র প্রাপ্ত হন; এবং স্বয়ং বঙ্গরাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাগমনে অসম্মত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসকে তথায় প্রেরণ করেন। পাণ্ডু-বাস লঙ্কায় উপনীত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বেই বিজয়ের মৃত্যু হইয়াছিল; এবং তাহার অবর্ত্তমানে উপতিস্য-নামা তাহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডু-বাসের আগমনে তিনি রাজ্যত্যাগ করত পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন ও পাণ্ডুবাস লঙ্কার রাজা হন। তদবধি ১২২২ বঙ্গাব্দে সিংহলদ্বীপে ইংরাজদিগের রাজ্যস্থাপন কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ২৩২৪ বৎসর লঙ্কাদ্বীপ বঙ্গজ পাণ্ডুবাসের এবং তাঁহার ছয় শ্যালকের উত্তরাধিকারিগণ দ্বারা পালিত ও শাসিত হইয়া-ছিল; মধ্যে মধ্যে কএকবার মলবারদেশীয় রাজারা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া তথায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজদিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে পোর্ত্তুগিস্ ও ওলন্দাজেরা লঙ্কার কোন কোন মণ্ডলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কখন সমস্ত রাজ্য তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।

পম্পেয়াই।

ইংরাজী ৭৯ অব্দের ২৪ শে আগষ্ট তারিখে সুবিখ্যাত ইতালী দেশের পম্পেয়াই নামক একটী নগর অপরাহ্নের মনোহর সূর্য্যকিরণে বিভাসিত হইতেছিল। তৎসময়ে আকাশ পরিনির্ম্মল ও কমনীয় বর্ণে বিচিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ শীতল এবং

উল্লাসকর, বৃক্ষ সকল ফলভারে অবনত, এবং উদ্যান সকল সুগন্ধ পুষ্পে প্রসাদিত ছিল। সম্মুখে নেপল্‌সের উপসাগর আপন শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থকে দেব-লোকের শোভায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল; সকলই উজ্জ্বল, সকলই কান্তিময়, সকলই মনোহর, সকলই কমনীয়, সকলই সুরলোক-গঞ্জন বোধ হইতেছিল। নগরের প্রজা সকল ঐ রম্য সময়ের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন অভিলষিত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল। কেহ ক্রয় করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে, কেহ পণ্যশালায় পণ্য দ্রব্য আনিতেছে, কেহ বা তাহা বিদেশে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে নিকটস্থ বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে হঠাৎ এক রাশি কৃষ্ণ-ধূম নির্গত হইয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভাকারে উন্নত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ ধূম নির্ম্মল প্রোজ্জ্বল নভোমণ্ডলকে একেবারে আচ্ছন্ন করিলেক। দিবাকর বিলুপ্ত হইলেন, এবং সমস্ত নগর ও বহুক্রোশ পর্য্যন্ত নগরোপান্ত অমাবস্যার মধ্যরাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অকস্মাৎ এ অন্ধকার যে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অধিকন্তু ঐ অঞ্জনগিরি-সদৃশ নিবিড় কৃষ্ণমেঘে জলন্ত গন্ধকজাত ঈষন্নীলবর্ণ সৌদা-মিনী-সদৃশ অগ্নিশিখা মধ্যে মধ্যে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহার অনতিবিলম্বে আকাশ হইতে অতি সূক্ষ্মপ্রায় অদৃশ্য রেণু সদৃশ ভস্ম বরিষণ হইতে লাগিল, এবং তাহা অল্পকাল-মধ্যে ভূপৃষ্ঠে দুই তিন হস্তাধিক স্থূল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই পম্পেয়াইনিবাসীদিগের বিপদের শেষ হয় নাই। তদনন্তরই উত্তপ্ত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড সকল আকাশ হইতে নিপ-

ত্তিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরও তাহার সহযোগী হইল। একে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, তাহার উপর ভস্মবৃষ্টি, তদুপরি প্রস্তর-বর্ষণ, মধ্যে মধ্যে প্রজ্জ্বলিত গন্ধকের সৌদামিনী ; বর্ণিত সুখের সময় ইহার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হঠাৎ সম্ভাবনীয় নহে! কিন্তু পম্পেয়াই নিবাসীদিগের ইহাতেও ক্লেশের শেষ হইল না। কথিত প্রজ্জ্বলিত গন্ধকের ধূমে বায়ু প্রকৃষ্টরূপে দূষিত হইল; শ্বাস গ্রহণ করা দুষ্কর। অতঃপর নদীতে বান আসিবার সময় যে প্রকার শব্দ হয় তদ্রূপ ধ্বনি আকর্ণিত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বে কৃষ্ণকর্দ্দমের এক প্রকাণ্ড স্রোতঃ মৃদুভাবে অবারিতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা ত্বরায় রাজপথ সকল পরিপূর্ণ করিলেক, এবং দ্বার গবাক্ষ-ছিদ্রাদি দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়মাত্র ছিল না। যে যদ-বস্থায় এই ভীষণ শত্রুর হস্তে পড়িল সে সেই অবস্থায় প্রোথিত হইল। যাহারা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল তাহারা তথায়ই আবৃত রহিল; যাহারা পলায়নে তৎপর হইয়া রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদের কেহ পতনশীল শিলার আঘাতে মৃত হইল, কেহ গন্ধকের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, কেহ অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রমে গর্ত্তে পড়িয়া ভস্মে প্রোথিত হইল, কেহ বা কর্দ্দমস্রোতে প্লাবিত হইল। যে সকল ব্যক্তি বর্ণিত বিপদের প্রারম্ভেই নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অন্ধকারে পথশ্রমে ভস্ম ও গন্ধক-ধূমে আবৃত হইয়া নগর-প্রান্তে ধরাশয্যায় মহানিদ্রায় সুপ্ত হইল।

তিন দিন দিবা-রাত্র কথিত উপদ্রব বলবৎ থাকে, তাহাতে বর্ণিত নগর এককালে প্রোথিত হইয়া যায়, চতুর্থ দিবস প্রাতে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। তখন অন্ধকারের শেষ হইয়াছিল, কর্দ্দমস্রোতঃ স্তব্ধ হইয়াছিল, ভস্মবৃষ্টি নিঃশেষ হইয়াছিল, এবং প্রস্তরবর্ষণ স্থগিত হইয়াছিল। তখন দিবাকর পুনঃ প্রোজ্জ্বল রশ্মিতে সমস্ত বিভাসিত করিলেন। বায়ু দুর্গন্ধ গন্ধক গন্ধ ত্যাগ করিয়া পুনঃ নির্ম্মল হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে সকল প্রমুদিত করিল, এবং যে সকল দুর্ভাগারা বর্ণিত উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু তাহাদের গৃহের আর চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইল না। যে স্থানে পম্পেয়াই নগরের মন্দির দেউল অট্টালিকা রাজপ্রসাদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ইষ্টক-প্রস্তরের বাটী সকল দেদীপ্যমান ছিল, তথায় এক ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপমাত্র দৃষ্ট হইল; উক্ত নগরের সন্নিকটে হর্কুলেনিয়ম এবং স্তাদী নামক অপর দুই সমৃদ্ধ নগরও প্রোথিত হইয়াছিল, অতএব কথিত স্তূপ বহু ক্রোশ বিস্তীর্ণ দৃষ্ট হইত। ঐ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কালক্রমে মৃত্তিকা জমিয়া শস্যের উপযুক্ত হইল; এবং কৃষকেরা তথায় দ্রাক্ষা জলপাই গোধূমাদি দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ বনস্পতি সকলও উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানকে উদ্যান-সদৃশ করিলেক।

প্রায় সপ্তদশ শত-বৎসর যাবৎ বর্ণিত স্থান ঐরূপ থাকে। পরে গত শতাব্দীর শেষে কৃষকেরা গহ্বর খনন দ্বারা দেখিলেক যে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির চিহ্ন আছে; তাহাতে বোধ হইল, যে কোন নগর তথায় প্রোথিত আছে; এবং

অনুসন্ধান দ্বারা তাহাই সাব্যস্থ হইল। নেপল্‌স্‌ দেশের অধিপতির অনুমতিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইল। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক হইতে খননকার্য্য আরব্ধ হইল, এবং অল্প দিন মধ্যে পম্পেয়াই নগরের অনেক রাজপথ অট্টালিকাদি পরিস্কৃত হইয়া পুনঃ সকলের নয়নগোচর হইল। এই দর্শন অতি অপূর্ব্ব বোধ হইয়াছিল। কোন স্থানে অতি বৃহৎ অট্টালিকা ঝাড় লণ্ঠন ছবি প্রস্তর-পুত্তলিকাদি বিবিধ সজ্জায় পরিসজ্জিত অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছে; কোন কোন স্থানে নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ পণ্যশালা প্রকাশ হইতেছে, কোথায় বা মোদকের দোকানে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন মৃত্তিকাবরণে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। এক সূপকারের দোকান খনন করিতে করিতে দৃষ্ট হইয়াছিল যে বর্ণিত উপদ্রব সময়ে ঐ দোকানী সম্মুখে রোটিকা ও পেয়াজ ও ক্ষুদ্র মৎস্যের চচ্চড়ী বিক্রয় করিতেছিল, এবং সেই অবস্থায় সে কর্দ্দমে প্রোথিত হয়। এক বৃহৎ অট্টালিকার সকল গৃহ নানাবিধ সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু কুত্রাপি মনুষ্য ছিল না; কেবল তাহার নিম্নে ভূমিগর্ভে এক গুদামের মধ্যে, যাহাতে অনেকগুলি জালা ছিল, তথায় ১৭টী অস্থিকঙ্কাল রহিয়াছে। জালা দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ ভূমিগর্ভস্থ গুদামে গৃহস্বামী মদিরা রাখিতেন। উপদ্রবের প্রারম্ভে ভস্মবৃষ্টির সময় গৃহস্বামিনী আপন অপত্য ও ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে ঐ গুদামে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথায় কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকে প্রোথিত করিয়া ফেলে। যদিচ এক্ষণে তাহাদের অস্থিমাত্র অবশিষ্ট অছে, কিন্তু মৃত্তিকা-

মধ্যে তাহাদের দেহের ও বস্ত্রের ও অলঙ্কারাদির চিহ্নে এমত অবিকল ছাঁচ হইয়া আছে যে তদ্দৃষ্টে তাহাদের সমস্ত বিবরণ উপলব্ধি হয়। অনুমিত হইয়াছে যে ঐ সপ্তদশ ব্যক্তির মধ্যে এক জন গৃহমেধিনী। তিনি প্রৌঢ়া ছিলেন; তাঁহার দেহে অনেক অলঙ্কার ছিল, ও তাঁহার বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম রেশমে নির্ম্মিত। তাঁহার এক হস্তে একখানি রুমালে কতকগুলি চাবি বদ্ধ ছিল; অপর হস্তে একটী শিশুর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে এক নব-যৌবনা কন্যা চারু-বসনাভরণে সুসজ্জিতা ও ভয়ে ভীতা হইয়া রক্ষা-প্রার্থনায় কেবল মাতার প্রতি অবলোকন করি-তেছে। তাহার অল্প বয়স্ক দুই ভ্রাতা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছে। সন্নিকটে পরিচারিকা ও ভৃত্যবর্গ; তাহাদিগের বস্ত্র স্থূল ও অলঙ্কার সামান্য। সম্মানরক্ষার্থ সহসা স্বামিনীর অত্যন্ত নিকট তাহারা আসিতে পারিতেছেনা, অথচ কর্দ্দমস্রোতঃ হইতে পলাইবার আর স্থান নাই, অতএব অত্যন্ত কুণ্ঠভাবে নিকটে রহিয়াছে। ইহাদের অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয়, কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া ইহাদিগকে এক-কালেই বিনষ্ট করিয়াছিল; অধিক যাতনা না দিয়া থাকি-বেক! এক রমণী আপন প্রিয় অলঙ্কারের মঞ্জুষা লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাকে আবৃত করে। সে সেই মঞ্জুষা বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে। এক স্থানে দুই জন তস্কর একটা ধাতুময় পুত্তলিকা লইয়া পলাইতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাদিগকে আবৃত করে। এই প্রকারে অপরাপর

স্থানে নানা অবস্থার বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে। খনন দ্বারা যে সঙ্খ্যায় ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি ও গৃহসজ্জা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, পম্পেয়াই এক ঋদ্ধিমন্ত নগর ছিল, এবং ঐ সকল মূর্ত্তি ও দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যে বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হয় যে ঐ নগরবাসীরা শিল্পকার্য্যে অদ্বিতীয় নিপুণ ছিল।

বিজ্ঞান-রহস্য।

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।)

বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অবস্থা।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ মহারণ্যে পরিবৃত ছিল, তাহা এক্ষণে জনাকীর্ণ নগর, রমণীয় উদ্যান ও শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শোভা পাই-তেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যেখানে একটী সঙ্কীর্ণ পথও দৃষ্ট হইত না, এক্ষণে তথায় সুপ্রশস্ত পরিষ্কৃত, বৃক্ষশ্রেণী-বিরাজিত, সুশীতল-ছায়া-সমন্বিত রাজবর্ত্ম বিনির্ম্মিত হই-য়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল স্থল দূর ও দুর্গম বলিয়া বোধ হইত ও যাহা কেবল পরমার্থচিন্তাপরায়ণ বৃদ্ধ ও পরিণত-বয়স্কদিগের ও সংসারাসক্তি-শূন্য-জনগণের গমনীয় ছিল,

সেই সকল মহাতীর্থ এক্ষণে তরুণবয়স্ক বালকবৃন্দের পক্ষেও সাতিশয় সুগম হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে পথে পদে পদে ত্রাস ও শঙ্কা উপস্থিত হইত, এক্ষণে সেই পথ দিয়া ঘোরতমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়েও নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্ক-চিত্তে লোকে গমনাগমন করিতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে লৌহময় দ্বার রুদ্ধ করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা দ্বার মুক্ত রাখিয়াও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যাঁহাদের গঙ্গা পার হইতেও সাহস হইত না, তাঁহারা এক্ষণে অপার পারাবার পার হইয়া নানা দিগ্দেশ সন্দর্শন করিতেছেন ও তত্রত্য অধিবাসী-দিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতেছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য জাতির সংস্কৃত-কাননে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু এক্ষণে কি আর্য্য, কি অনার্য্য, সকলেই সেই অনুপম শোভাসম্পন্ন উপবনে প্রবেশ করত তদীয় বিকসিত, কুসুম সমুদায়ের গন্ধানুভব ও সুরস তরু-নিকরের ফলাস্বাদ করিয়া নিরুপম আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পাঁচ কোটি লোককে রাজকীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত পাঁচটী বিদ্যালয়ও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তদুদ্দেশে অন্যূন পাঁচ সহস্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চাশৎ ব্যক্তিও রাজকীয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে অন্যূন পঞ্চ লক্ষ লোকে উহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প

হইয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, কিন্তু এক্ষণে শত শত পুস্তক দিন দিন মুদ্রিত হইতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে সমাচার-পত্রের নামও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে যে কত সমাচার-পত্র ও সাময়িক পত্র প্রতিদিন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। কিন্তু যখন মনে হয় যে, যে মহা-পুরুষদিগের শৌর্য্য বল বীর্য্য ও ঔদার্য্য গুণে এদেশের এতাদৃশ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা যদি অদ্য ভারত-ভূমি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কল্য ইহার ভাগ্যে কি ঘটিবে; তখন ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অবসন্ন ও অন্তঃকরণ একান্ত অভিভূত হয়। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, যদি ইংরেজেরা অদ্য এদেশ হইতে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে কল্য রাজপুত, মহা-রাষ্ট্রীয়, পাঠান ও অন্যান্য সংগ্রামপ্রিয় জাতিদিগের মধ্যে ইহার সাম্রাজ্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ সমুপস্থিত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, সেই দারুণ সমরানলে শত শত গ্রাম ও নগর, সহস্র সহস্র সুরম্য হর্ম্ম্য ও লক্ষ লক্ষ নয়নরঞ্জন বিবিধসামগ্রী-পরিপূর্ণ বিপণি সকল ভস্মীভূত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, সেই সুদারুণ সময়ে ভারততনয়দিগের শোণিত-প্রবাহে দেশ সকল প্লাবিত হইবে এবং লোকের ক্রন্দনধ্বনি ও মার্ মার্ হাহাকার শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইবে।

কোন্ বুদ্ধিমান্ স্বীকার না করিবেন যে, তৎকালে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র, গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্র সকলই বিলুপ্ত হইবে এবং অজ্ঞান-তিমির আসিয়া ভারতের জ্ঞানসূর্য্যকে গ্রাস করিবে। ফলতঃ এই সময় হইতে সবিশেষ যত্ন না করিলে, যাঁহাদের প্রসাদে আমরা এতাদৃশ সুখ সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহারা এদেশ পরিত্যাগ করিলে এই সমস্ত সুখরাশি হইতে আমাদিগকে একান্তই বঞ্চিত হইতে হইবে। অতএব যাহাতে এতদ্দেশীয় জনগণ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করত স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি ও আপনাদের সুখবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন, সাধ্যানুসারে তাহার উপায় বিধান করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি। হে ভারত-তনয়গণ! আর কতকাল তোমরা এরূপ মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে, আর কত কালই বা তোমরা আর্য্য-বংশসম্ভূত হইয়া ম্লেচ্ছদিগের পাদলেহন করিবে। অতঃপর জাগরিত হও এবং আপনাদের উন্নতি-সাধনে ও স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর!

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনের ফল।

যে শাস্ত্র দ্বারা বিশ্বব্যাপার সমুদায় কিরূপ নিয়মানুসারে নিষ্পাদিত হইতেছে, তাহা আমরা অবগত হইয়া অনাগত বিষয়ও অনায়াসে গণনা করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র। ফরাসিদেশীয় মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত চূড়ামণি মহাত্মা কোম্তে বলেন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন জীবনতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, এই কয়েকটী বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের গতি ও পরিমাণাদি নিরূপিত হয়। পদার্থদর্শনে জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম এবং তাপ, আলোক ও তাড়িতাদি প্রাকৃতিক শক্তির বিষয় বর্ণিত থাকে। রসায়ন-শাস্ত্রে একজাতীয় দ্রব্যের সহিত অন্যজাতীয় দ্রব্যের সংযোগ বা বিয়োগ বশতঃ কিরূপ গুণান্তর উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। জীবনতত্ত্বে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত এবং আত্মবিদ্যায় মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ উল্লিখিত হয়। আর সমাজতত্ত্বে সমাজ-সংস্থিতির নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, এই সকল শাস্ত্রগুলির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটী অপেক্ষা পরপরটীর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দুরূহ ও জটিল। মহাত্মা কোম্তের মতে জ্যোতিষ ও সমাজতত্ত্ব যথাক্রমে বিজ্ঞানরূপ বর্ণমালার আদ্য ও অন্ত্যবর্ণ।

বিজ্ঞানশাস্ত্র-অনুশীলনে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় যেরূপ মার্জ্জিত হয়, অন্যশাস্ত্র-শিক্ষায় কদাপি সেরূপ হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্র-প্রকাশিত অশ্রুতপূর্ব্ব ও অবিদিতপূর্ব্ব ব্যাপার সকল অবগত হইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দের সঞ্চার হয়, কবি-কপোল-কল্পিত অলীক উপাখ্যান পাঠে কখনই সেরূপ হয় না। ভারতভূমির উত্তরে—যেখানে এক্ষণে অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, নগাধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে অবস্থিতি করিতেছেন—তথায় এককালে সাগরজলে জলচর জীব সকল

অধিবাস করিত ও সুমেরুসন্নিহিত চিরনীহারাবৃত ভূভাগে পূর্ব্ব-কালে ভূধরোপম, লোম-পরিবৃত গজেন্দ্র সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব এই জীবলোকে রাজত্ব ও প্রধানত্ব করিয়া আসিতেছে, কখন কীটাণুগণ, কখন শঙ্খশম্বূকাদি, কখন মৎস্য, কখন বা সরীসৃপ, কখন বা পশ্বাদি এই জীবলোকে আধিপত্য করিয়াছে ও অবশেষে মনুষ্য আসিয়া সমগ্র ধরাতল স্বীয়করতলস্থ করিয়াছেন ও কালসহকারে উৎকৃষ্টতর জীবের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাহারও তিরোভাব হইতে পারে; এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, কবিকল্পিত কাল্পনিক উপন্যাস পাঠে কখনই সেরূপ হয় না।

বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যে শক্তি প্রভাবে বৃক্ষাদি হইতে ফলাদি ভূতলে নিপতিত হয়, সেই শক্তির গুণেই চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ও পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রামিত হইতেছে। ইহা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, হীরক ও অঙ্গার একই পদার্থ; এবং ইহা দ্বারাই অবধারিত হইয়াছে যে, গন্ধকাদি কতিপয় পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে যে শক্তির সঞ্চার হয়, সেই শক্তি দ্বারাই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যার অনুশীলন-গুণে আমরা অবগত হইয়াছি যে, দহনশীল বায়ুবিশেষ হইতে অনলবৈরি জলের জন্ম হইয়াছে এবং প্রাণনাশক বায়ুবিশেষের

সহিত অপর একটী বায়বীয় পদার্থের সম্মিলনে জগৎ প্রাণ সমীরণ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানবসমাজের যে সকল মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা দুঃসাধ্য। বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকট, মুদ্রাযন্ত্র ও ঘটিকাযন্ত্র, দিগ্‌দর্শন, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ, তারের সংবাদ ও গ্যাসের আলোক ইহারা সকলেই বিজ্ঞানশাস্ত্রমহিমা প্রচার করিতেছে। অধিক কি, এই বিদ্যাপ্রভাবে ইউরোপখণ্ড-নিবাসী জনগণ ধরাধামে বাস করিয়াও স্বর্গীয়-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

অধুনা এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজি ভাষা ও তৎ-সহকারে ইংরাজি সাহিত্যাদির সবিশেষ আলোচনা হইতেছে। পরন্তু যে বিদ্যাপ্রভাবে আমাদিগের রাজপুরুষগণ এতাদৃশ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, সেই পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রায় কোন বিদ্যালয়েই দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক কাব্যরসাস্বাদনার্থ কিংবা আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশের নিমিত্ত, বাল্মীকি ও কালিদাস এবং বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য থাকিতে ভারতসন্তানদিগের সেক্স‌পীয়র ও মিল্টন, কি প্লেতো ও বর্ক্লি'র উপাসনা করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বিজ্ঞানশৈলে আরোহণ করিতে হইলে, আর্য্যবংশীয়দিগকে বেকন ও নিউটনের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব যদি বুদ্ধিবৃত্তি-সমুদায়ের যথাবিধানে পরিচালনা করা প্রার্থনীয় হয়, যদি বিশ্বব্যাপার সমুদায়ের কারণ অনু-সন্ধান করা মানবীয় মনের স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি গগনমণ্ডলস্থ

গ্রহনক্ষত্রাদির আকার প্রকারাদি পর্য্যালোচনা করা প্রীতি-প্রদ বলিয়া প্রতীতি হয় এবং যদি জল, বায়ু, তাপ, তাড়িতাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ুরাশি।

আমাদিগের আবাসভূমি বসুন্ধরা বিশাল বায়ুরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ুরাশি অনবরত ভ্রাম্যমান হইতেছে এবং বর্ষে বর্ষে সূর্য্যমণ্ডলকে এক এক বার প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই বায়ুরাশি সুগভীর সমুদ্র হইতেও গভীর ও অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতেও উচ্চ; কেহ কেহ অনুমান করেন ইহার উন্নতি এক শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহা হউক, ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্যূন পঞ্চবিংশতি ক্রোশ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। যেরূপ মৎস্যাদি জলচর জীবগণ বারিনিধি-সাগরে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমরা এই প্রবিস্তীর্ণ বায়ুময় সাগরে বাস করিতেছি। ইহা এরূপ লঘু, যে প্রজাপতির পক্ষ দ্বারাও সঞ্চালিত হয়, অথচ ইহা দ্বারাই আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণব-পোত দুস্তর সাগরপারে নীত হইয়া থাকে। কখন বা ইহা এরূপ প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করে যে, ঊর্ণনাভের তন্তুও ইহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না, আবার কখন বা ভীষণাকার

ধারণ করিয়া এরূপ প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে থাকে যে, ইহার ভয়ঙ্কর আঘাতে তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গও চূর্ণ হইয়া যায়। কখন বা সুমন্দ হিল্লোল আমাদিগের সর্ব্বশরীর শীতল করে এবং কখন দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আমাদিগকে ব্যাকুলিত করে। কখন বা মৃদু মন্দ লহরীলীলায় জনগণকে পুলকিত করে এবং কখন বা উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে আকুলিত করে। কখন বা শারদীয় পঞ্চমীতে ধনরত্ন-লোকাদি-পরিপূর্ণ নৌকা জলমগ্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাপ ও ক্রন্দন-ধ্বনি বিস্তার করে এবং কখন বা অরাতিপরিবেষ্টিত পুরীশ্রেষ্ঠ পারী নগরী হইতে ব্যোমযান আনয়ন করত তথায় যে সমস্ত মহাত্মগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ প্রদান করিয়া আমাদিগকে আহ্লাদিত করে।

বায়ু না থাকিলে, কি উষাকালীন পরম রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়ন-গোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে, নিশাবসান না হইতে হইতেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উদিত হইয়া খরতর কর বর্ষণপূর্ব্বক জীবগণকে দগ্ধ করিত এবং দিনশেষ না হইতে হইতেই দিন-মণি বসুন্ধরাকে ঘোরতর তিমিরসাগরে নিমগ্ন করিয়া অস্ত-মিত হইত। বায়ু না থাকিলে, দীপাদি আলোক প্রদান করিত না ও কাষ্ঠাদি হইতে বহ্নি উৎপন্ন হইত না। বায়ু না থাকিলে, কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনীরূপ সিথিতে সমুজ্জ্বলিত হইত না। বায়ু না থাকিলে, বিমানচারী বারিদ-গণ বারি বর্ষণ করিত না। বায়ু না থাকিলে পর্ব্বতনন্দিনী

সুস্বাদু-সলিল-শালিনী প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীগণ কলকল রবে প্রবাহিত হইত না। বায়ু না থাকিলে শ্যামলদূর্ব্বাদল-শিরে শিশিরবিন্দু সকল মুক্তাফলরূপে কখনই শোভা পাইত না। বায়ু না থাকিলে, কি বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দ কি পক্ষিগণের কলরব, কি সুমধুর গীতধ্বনি, কি ঘোরতর বজ্রনাদ, কিছুই আমরা শুনিতে পাইতাম না। অন্য কথা দূরে থাকুক, বায়ু না থাকিলে আমবা ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিতাম না। এই নিমিত্তই ইহার জগৎপ্রাণ নামটী অন্বর্থ হইয়াছে।

প্রাচীনেরা বায়ুকে মূল পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত হইতে যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে; পরন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানপরায়ণ মনীষিগণ বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যতদূব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, ক্ষিতি জল ও বায়ু যৌগিক পদার্থ; আর আকাশ এক প্রকার অতি বিরল সূক্ষ্ম ও স্থিতিস্থাপক-গুণ-সম্পন্ন পদার্থ, উহা সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং উহারই সঞ্চালনে তেজের সঞ্চার হয়। রসায়নবেত্তা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন অম্লজনক ও যবক্ষারজনক নামক দুইটী বায়বীয় পদার্থের মিলনে জগৎপ্রাণ সমীরণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। রাসায়নিকদের মতে বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, কেন না ইহার উপাদানদ্বয় রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে, একত্র মিশ্রিত হইয়া আছে এই মাত্র। পূর্ব্বোক্ত অম্লজনক-নামক বায়বীয় পদার্থটী

আমরা নিশ্বাস সহকারে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহার অভাবে এক মুহূর্ত্তও আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি না; এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে 'প্রাণবায়ু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অম্লজনক বায়ুর দাহিকা শক্তি অতি চমৎকার। একটী নির্ব্বাপিত দীপশলাকার অগ্রভাগ মাত্র লাল থাকিতে থাকিতে যদি অম্লজনক-বায়ু-পূর্ণ কোন পাত্র-মধ্যে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে উহা অমনি তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ফলতঃ কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্গত দাহ্য পদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজনকের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির সহিত বায়ুস্থিত অম্লজনকের সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। অম্লজনকের দাহকতাশক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর যে বায়ুরাশিতে যদি শুদ্ধ অম্লজনক থাকিত তাহা হইলে তাবৎ বস্তু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এই নিমিত্ত করুণানিধান পরমেশ্বর যবক্ষারজনক-নামক অপর একটী কোমলস্বভাব বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার উগ্রস্বভাবের খর্ব্বতা সম্পাদন করিয়াছেন। উল্লিখিত অম্লজনক ও যবক্ষারজনক নামক দুইটী পদার্থ ব্যতীত বায়ুরাশিতে আরও কতিপয় পদার্থ আছে, তন্মধ্যে অঙ্গারিকাম্ল বায়ু প্রধান। জীবগণ নিঃশ্বাসের সময় বায়ুস্থ অম্লজনক শরীর-মধ্যে গ্রহণ করে এবং অঙ্গারিকাম্ল নামক একপ্রকার বিষাক্ত বায়ু বিসর্জ্জন করে। কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিলেও এই বিষম বায়ু উৎপন্ন হয়। দীপাদি জ্বালাইলেও

ইহার উৎপত্তি হয়। যাত্রা মহোৎসবাদির রাত্রিতে উৎসব-ভূমিতে যে লোকের এত কষ্ট হয় তাহার কারণ এই যে সমাগত লোকদিগের নিঃশ্বাস-বিনিঃসৃত ও দীপাবলী-সমুত্থিত অঙ্গারিকাম্ল বায়ুতে তথাকার বায়ুরাশি দূষিত হইয়া উঠে। পরন্তু এই অঙ্গারিকাম্ল বায়ু উদ্ভিজ্জগণের পক্ষে মহোপকারী। প্রাণিগণ যেরূপ অম্লজনক গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, উদ্ভিজ্জগণ সেইরূপ অঙ্গারিকাম্ল বায়ু হইতে অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। উদ্ভিজ্জেরা অঙ্গারিকাম্লের অম্লজনক ভাগ বিসর্জ্জন করে এবং আমরা সেই অম্লজনক লইয়া অঙ্গারিকাম্ল বায়ু পরিত্যাগ করি।

বায়ুরাশিতে জলীয় বাষ্প বিদ্যমান আছে। যেখানকার বায়ুতে জলীয় বাষ্প নাই সেখানে আমরা কদাচ থাকিতে পারি না। লুঃ, সাইমুন প্রভৃতি বাতাস যে এত ভয়ঙ্কর, উহাতে জলীয় বাষ্প নিতান্ত অল্প থাকাই তাহার কারণ। বায়ুরাশিতে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা শিশির কুজ্‌ঝটিকা ও মেঘরূপ ধারণ করিয়া বসুন্ধরাকে শীতল করিয়া থাকে।

শিশির।

রাত্রিকালে ভূতলস্থ-বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ু-রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দু রূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। দিবাভাগে

সূর্য্যকিরণ-সংযোগে পৃথিবী-পৃষ্ঠ সমুত্তপ্ত হইলে তৎসংসৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকীর্ণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণে বাষ্প থাকিবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যত হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত কম বাষ্প থাকিতে পারে, অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক শীতল হইলে, যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, শীতল দ্রব্য স্পর্শ-মাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির-বিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির-সঞ্চার হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকীরণ শক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, একারণে সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশিরসঞ্চার হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকীরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি সমধিক-বিকীরণ-শক্তিসম্পন্ন দ্রব্যাদির উপর প্রচুর পরিমাণে শিশিরসঞ্চার হইয়া থাকে।

যদ্দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তেজ বিকীরণের প্রতিবন্ধকতা হয়, তদ্দ্বারা শিশির সঞ্চারেরও প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে।

আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে ভূপৃষ্ঠ তেজ বিকীরণ দ্বারা তাদৃশ শীতল হইতে পারে না, কেননা মেঘাবলী হইতে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপর পতিত হয়, একারণ মেঘাচ্ছন্ন নিশিতে সেরূপ শিশিরসঞ্চার হয় না। বিস্তৃত-শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন হয় না।

বায়ু যত সরস হয়, শিশিরসঞ্চারও তত অধিক হইয়া থাকে। মন্দ মন্দ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে দ্রব্যাদি সমধিক শীতল হয় এবং শিশিরসঞ্চার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে তৎসংস্পর্শে দ্রব্যাদি উষ্ণ হয় একারণ শিশির উৎপন্ন হয় না।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ভাব।

তুষারাকীর্ণ তুঙ্গশৃঙ্গসম্পন্ন পর্ব্বত শ্রেণী, বিস্তৃতশাখাসমন্বিত-মহীরুহসমাকীর্ণ মহারণ্য, প্রতপ্তবালুকাপূর্ণ প্রবিস্তীর্ণ মরুভূমি, দারুণ-হিমানী আবৃত ভীষণ প্রান্তর, নবীনদূর্ব্বাদলপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র ও নীলাম্বুরাশিপরিপূর্ণ সীমাশূন্য সুগভীর সমুদ্র পরিশোভিত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সন্দর্শন করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশের অবস্থা অবগত হইতে কোন্ চিন্তাশীল জনের চিত্তে কৌতূহল-শিখা সমুদ্দীপ্ত না হয়? পরন্তু ভূপৃষ্ঠ যেরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়, ভূগর্ভ সেরূপ নহে। এ নিমিত্ত আমরা পৃষ্ঠদেশের আকার প্রকারাদি অবধারণে সমর্থ হইলেও অভ্যন্তর ভাগের নৈসর্গিক ভাব নির্ণয় করিতে নিতান্ত অক্ষম।

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও সীতাকুণ্ডাদির জলের উষ্ণতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে সৌর তেজ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ ভূপৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায় ততই প্রতি ৬০ ফুটে ১ অংশ করিয়া উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ভূপৃষ্ঠ হইতে কতিপয় ক্রোশ নিম্নে তাপের এরূপ ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ তাবৎ দ্রব্যই দ্রব হইয়া যায়। আরও সকলেই-অবগত আছেন পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা। আবর্ত্তনবশতঃ তরল বস্তুরই কেবল ঐরূপ আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, কঠিন বস্তুর ওরূপ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে; ফলতঃ এই সকল কারণে অনেকে অনুমান করেন সমুদায় ভূমণ্ডল এককালে তরল ও অগ্নিময় ছিল; পরে বহুকাল পর্য্যন্ত অবিরত তেজ বিকীর্ণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে পৃষ্ঠভাগ কঠিনাকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে এখন পর্য্যন্ত অগ্নিময় সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সমুদায় ভূমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ অধিক; কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ প্রস্তরাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫ হইতে অধিক নহে। সুতরাং বলিতে হইবে ভূপৃষ্ঠস্থ দ্রব্যাদি অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত ভারী। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময়, দ্রব এবং অপেক্ষাকৃত গুরু দ্রব্যে পরিপূর্ণ।

মহাসাগর।

যে বিশাল জলরাশি অবনীমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যে বিস্তীর্ণ লবণার্ণবের বক্ষঃস্থলে স্থানে স্থানে পর্ব্বত কানন গ্রাম নগরাদি সমাকীর্ণ দ্বীপ উপদ্বীপ ও মহাদ্বীপাদি স্থলভাগ শোভা পাইতেছে, যে নীলাম্বুরাশির হৃদয়াকাশে দিনমণি সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে সিন্ধুনাথের সীমা-শূন্য সাম্রাজ্যের কোন না কোন অংশে দিবা রাত্রি শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতেছে, যে মহার্ণবের উপকূল কোথাও শ্যামলতালীকুঞ্জে ও কোথাও বা শুভ্রবর্ণ তুষারজালে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে; যে মহাসাগবের করালতম কল্লোল কোলাহল হিমানী-আবৃত-আগ্নেয়-গিরি-বিরাজিত কুমেরু হইতে তুষারাচ্ছন্ন সলিলাকীর্ণ সুমেরু পর্য্যন্ত নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে; যে বারিরাশি হইতে বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইয়া বারিদরূপে বারি বর্ষণ-পূর্ব্বক আতপতাপিত বসুন্ধরাকে সুশীতল করিয়া ফলপুষ্পে বিভূষিত করিতেছে, যে নীলাম্বুনিধি নিরুপম নীলবর্ণ দ্বারা নীরদশূন্য নির্ম্মল নীলনভস্তলকেও তিরস্কৃত করিতেছে, যে মহোদধি উত্তুঙ্গ তরঙ্গরূপ ভীষণ অশনি প্রহারে নিয়ত ভূভাগের বিনাশ সাধন করিতেছে, যে নীরনিধি কলানিধির আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিয়ত তাহার অনুসরণ করিতেছে, যে মহাসমুদ্র রজনীযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় জলচর জীব দ্বারা স্থানে স্থানে আলোকময় হইতেছে, যে পয়োরাশি নাবিক বিদ্যা-প্রভাবে পোতপরিচালনের প্রকৃষ্ট

পথস্বরূপে পরিণত হওয়াতে বিদূরস্থিত জনপদসমূহও সাতিশয় সন্নিহিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যে অম্ভোনিধির মন্থনে, পুবাণের বর্ণনানুসারে, সুশীতল- রশ্মিসম্পন্ন-শীতাংশু, শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী, মহামূল্য কৌস্তভমণি, হয়রত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, মহাগজ ঐরাবত ও অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সগরবংশীয়দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিবেচনায় পৌরাণিকেরা যাঁহারে সাগর নাম প্রদান করিয়াছেন—সেই সহস্র সহস্র শৈলনন্দিনী স্রোতস্বিনীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিষেবিত, মণিমুক্তা প্রবালাদি বিবিধ রত্নের নিকেতন, শঙ্খ-মৎস্যমকবাদি অসংখ্য-জলচর জীব নিবাস যাদসাম্পতি রত্নাকর মহাসাগবেব অপ্রমেয় আয়তন, অতলস্পর্শ গভীরতা, অত্যুৎকট লবণাক্ততা, অত্যুজ্জ্বল নীলবর্ণ ও পর্ব্বতাকার তবঙ্গাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়!

যে সমস্ত বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকাব করিয়া আমরা অধিবাস করিতেছি, এই মহাসাগরের সহিত তুলনা কবিলে তাহাকেও নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রায় চারিভাগের তিন ভাগ সাগবজলে সমাবৃত। ভূপৃষ্ঠের পরিমাণ প্রায় ১৯,৭০,০০,০০০ ঊনবিংশ কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৫,২০,০০,০০০ পাঁচ কোটি বিংশতি লক্ষ বর্গ মাইল মাত্র স্থল এবং অবশিষ্ট ১৪,৫০,০০০০০ চৌদ্দ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইল জল। স্থলভাগের ন্যায় সাগরতলও পর্ব্বত, উপত্যকা, ও অধিত্যকা-সমূহে সুশোভিত এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও ভূকম্পনে সমাকুলিত। যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী, মেঘশ্রেণী ভেদ করিয়া

ভূপিণ্ডোপরি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তদপেক্ষাও উচ্চতর শত শত শৈলরাজী ইহার অগাধ জলতলে বিরাজ করিতেছে। স্থলভাগে যে সকল আগ্নেয় গিরি দেখিতে পাওয়া যায় তদপেক্ষা শতগুণে ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র অগ্নিময় পর্ব্বত, সাগরমধ্যে স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভস্থিত কীরওয়া নামক যে আগ্নেয় পর্ব্বতটী জলরাশি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে কি বিসুবিয়স, কি এটনা আর কাহাকেই ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় না। যে সমস্ত সুদূরগামিনী প্রবাহিনী সাগরমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের সহিত তুলনায় সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি প্রবল প্রবাহকেও সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ এই মেদিনীমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ যে মহাসাগরের জলে সমাচ্ছন্ন, তাহার তুল্য বিশাল ও গাম্ভীর্য্যশালী পদার্থ আর কোথাও লক্ষিত হয় না।

অনেকে অনুমান করেন অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উচ্চতা যত, মহাসাগরের গভীরতা তদপেক্ষা অধিক নহে; অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল মাত্র। পরন্তু নিশ্চয়রূপে মহাসমুদ্রের গভীরতা নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। সাগরের গভীরতা সকল স্থলে সমান নহে; উপকূল হইতে যতদূরে যাওয়া যায় ততই গভীরতা বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়; যে স্থানে উপকূল ক্রমনিম্ন সেখানে অনেক দূর গমন না করিলে সুগভীর সমুদ্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আর যে স্থলে উপকূল অপেক্ষাকৃত উচ্চ সেখানে কিয়দ্দূর গমন করিলেই সুগভীর সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রজলে নানাবিধ লবণময় পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সহস্র ভাগ সমুদ্রজলে প্রায় তিন ভাগ সামান্য লবণ আছে। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা সমুদ্রজল ভারী। সমুদ্রজলের লবণাক্ততা সর্ব্বত্র সমান নহে; যেখানে বৃহৎ বৃহৎ নদী আসিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে সেখানকার জলের লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃত অল্প; আর যে স্থলে কোন নদীর সমাগম নাই অথচ প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভাবে নিয়ত বাষ্পরাশি উত্থিত হইতেছে সেখানকাব সাগরজল অত্যন্ত লবণাক্ত। যে স্থলে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, কি প্রভূত পরিমাণে বরফরাশি দ্রবীভূত হয়, তথাকার সাগরজল তাদৃশ লবণময় নহে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে কোন কোন স্থলে সমুদ্রগর্ভ হইতে সুস্বাদু জল উৎসাকারে উৎসারিত হয়।

মহাসাগরের বর্ণ গাঢ় নীল; গগনতল যেরূপ নীলবর্ণ, সাগরজলও প্রায় তদনুরূপ। কেহ কেহ বলেন সমুদ্রজলে নানাবিধ লবণময় দ্রব্য দ্রবীভূত আছে বলিয়া এরূপ নীলবর্ণ দেখায়, পরন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা নিশ্চয জ্ঞাত নহি। যখন কোন কোন নদীর জলও গাঢ় নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সমুদ্রজলের নীলবর্ণের কারণ যে তন্মিশ্রিত লবণরাশি ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। সমুদ্রজলের বর্ণ যে, সকল স্থানেই গাঢ় নীল এরূপ নহে; কোথাও বা হরিৎ, কোথাও বা শ্বেত, কোথাও বা লোহিত। উপকূল-সন্নিহিত জল মৃত্তিকামিশ্রিত হওয়াতে প্রায়ই বিবর্ণ।

গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সমুদ্রজলে রাত্রিকালে জল আন্দোলিত হইলে স্থানে স্থানে একপ্রকার অপূর্ব্ব আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন আভাময় কীটাণুবিশেষই তাহার কারণ। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সমুদ্রজল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ, আর তথা হইতে যত মেরু প্রদেশে যাওয়া যায় ততই উষ্ণতার হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়; মেরুসন্নিহিত প্রদেশের সমুদ্র সর্ব্বদাই বরফে আচ্ছন্ন। উপরের জল অপেক্ষা ভিতরের জল শীতল, পরন্তু মেরুসন্নিহিত প্রদেশে উপরিস্থ বরফ ও জলরাশি হইতে ভিতরেব জল ববং উষ্ণ।

বায়ু দ্বারা সমুদ্রজল চালিত হইলেই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রবল ঝটিকার সময়ে যে তরঙ্গ হয়, ৩০।৪০ হস্ত নিম্নে তাহার প্রভাব অনুভূত হয না। ভূমিকম্পনে সাগবতল কম্পিত হইলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয, তদ্দাবা তল প্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় জলবাশি আন্দোলিত হয়। সমুদ্রতরঙ্গের উন্নতি প্রায় ৩০।৪০ হস্ত হইতে অধিক উচ্চ হয় না।

চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে মহাসমুদ্রে জোয়ার হয়। পৃথিবীর যে স্থান যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত হয় তখন সেই স্থান অন্যান্য অংশ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তথাকার জল অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং তথাকার ঠিক পাদবিপক্ষ স্থানের জল অপেক্ষা সেই জলের ঠিক নিম্নস্থ কঠিন মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে চন্দ্রের নিকটস্থ হয় এবং তথাকাব জলও স্ফীত হইয়া

উঠে, (অথবা যদি স্ফীত হয় বলিলে বুঝিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে বল যে "ঝুলিয়া পড়ে")। চন্দ্র যদি ভূমণ্ডলের এক ভাগের উপরেই নিয়ত অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ আকর্ষণ নিবন্ধন পৃথিবীর আকারের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইত, কিন্তু জোয়ার হইত না। পরন্তু পৃথিবীর আহ্নিক-গতি নিবন্ধন ভূমণ্ডলস্থ এক স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নস্থ হইতে না হইতে আর এক স্থান আসিয়া তাহার নিম্নে অবস্থিত হয়, সুতরাং সমুদ্রমধ্যে এক অতি বিস্তৃত তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক-গতিপ্রযুক্ত চন্দ্র পৃথিবীর স্থানমাত্রেরই মাধ্যাহ্নিক রেখার উপর দিবা-রাত্রিতে দুই বার অবস্থিত হন, এই নিমিত্ত দিবা রাত্রিতে দুই বার জোয়ার হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে যেরূপ জোয়ার উৎপন্ন হয়, সূর্য্যের আকর্ষণেও সেইরূপ একটা জোয়ার উৎপন্ন হয়; পরন্তু চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া চান্দ্র জোয়ারের ন্যায় সৌর জোয়ার প্রবল নহে। অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত থাকিয়া আকর্ষণ করে এই জন্য এ সময়ে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়, আর অষ্টমী নবমীতে তাহারা পাশাপাশি হইয়া আকর্ষণ করে এই নিমিত্ত ঐ সময়ে অল্প পরিমাণ জোয়ার হয়। দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত প্রদেশে জলভাগ অধিক বলিয়া সেই স্থানেই জোয়ারের প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় এবং ঐ স্থানে যে জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাই চন্দ্রের অনুগমন করিয়া পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে। পরন্তু স্থলভাগের বাধা প্রযুক্ত

চন্দ্রের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত কোন স্থানের উপর দিয়া চন্দ্র গমন করিবার কিছুকাল পরে তথায় জোয়ার আইসে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে জোয়ারের সময় জলরাশি আন্দোলিত হয় কিন্তু পরিচালিত হয় না; একটী লৌহময় সুদীর্ঘ শৃঙ্খল ভূমির উপর বিস্তৃতভাবে রাখিয়া তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া ঝাড়া দিলে শৃঙ্খলটী চালিত না হইয়া যেরূপ আন্দোলিত হয়, সমুদ্রজলও জোয়ারের সময় চালিত না হইয়া তদ্রূপ আন্দোলিত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন কোন নদীর মোহানায় জোয়ারতরঙ্গ অতি প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হইয়া 'বান' উৎপাদন করে। জীব জন্তু জাহাজ প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয় তাহার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

মহাসমুদ্রের কোন কোন অংশে প্রবল প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যাতপ, বায়ুপ্রবাহ এই সকল সামুদ্রিক প্রবাহের কারণ। ক্রমাগত এক দিক্ হইতে বায়ু বহিলে সমুদ্রে স্রোত উৎপন্ন হয়। উত্তাপ প্রযুক্ত কোন স্থানে জল লঘু হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতল জল তদভিমুখে প্রবাহিত হয়। অপিচ বাষ্পোদ্গম হেতু যদি কোন স্থানের জল অপেক্ষাকৃত লবণময় ও গুরু হয়, তাহা হইলেও প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক স্রোতের মধ্যে 'উপসাগরীয় স্রোত' অতি প্রসিদ্ধ। এই প্রবাহটী মেক্সিকো উপসাগর হইতে উত্থিত হইয়া উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীতে এরূপ বৃহৎ প্রবাহ আর দ্বিতীয় নাই। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, হইতেও ইহা বেগগামী ও বৃহৎ।

সূর্য্য।

এই বিশাল সৌর জগতের মধ্যস্থলে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, পৃথিব্যাদি গ্রহগণ যাঁহারে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, যাঁহার প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দ্বারা সমুদায় জগৎ সমুদ্ভাসিত হইতেছে, যাঁহার অংশুমালায় বিভূষিত হইয়া হিমাংশু রমণীয় রশ্মিজালে রজনী যোগে গগনমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিতেছে, যিনি এই ভূলোকে এবং ভূলোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লোকসমূহে বৃক্ষ লতা ও জীব জন্তুদিগের জীবনোপযোগী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতেছেন, সেই সর্ব্বলোকপ্রকাশয়িতা গভস্তিমান্ সবিতার তেজস্বিতা ও মহত্বাদি ঘটিত যে সমস্ত মহত্তত্ব অবধারিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রভাতকালীন প্রভাকরের প্রসন্নমূর্ত্তি, মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর জ্যোতিঃ, ও অস্তগামী দিবাকরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, যে সমস্ত পুরাতন কবিগণ সুললিত কবিতাবলী রচনা করত তাঁহার স্তব করিতেন, না জানি তাঁহারা, তদীয় প্রবল প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলে, আরও কত সুমধুরতর পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন।

এই সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য তৎসমুদায় অপেক্ষা বৃহৎ। উহার আয়তন এরূপ প্রকাণ্ড, যে অবনীমণ্ডলের আয়তন অপেক্ষা প্রায় ১৩,৩১,০০০ ত্রয়োদশ লক্ষ একত্রিংশৎ সহস্র গুণ বৃহৎ। পরন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন,

পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন যাদৃশ বৃহৎ, ভার সেরূপ অধিক নহে। মেদিনীমণ্ডলের যে ভার, সূর্য্যমণ্ডলের ভার প্রায় তদপেক্ষায় ৩,৬০,০০০ গুণ মাত্র অধিক। কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, সৌর পদার্থ সকল পার্থিব পদার্থ অপেক্ষায় অপেক্ষাকৃত বিরল ও লঘু। ভূপৃষ্ঠস্থ বস্তু সকল পৃথিবী কর্তৃক যে বলে আকৃষ্ট হয়, সূর্য্য তাহার পৃষ্ঠ-দেশস্থ দ্রব্য সকলকে তদপেক্ষা ত্রিশগুণ অধিক বলে আকর্ষণ করে। ভূপৃষ্ঠ হইতে কোন বস্তু ঊর্দ্ধে তুলিতে যে বল লাগে, সূর্য্যমণ্ডলে তাহাকে তুলিতে হইলে তদপেক্ষায় ত্রিশগুণ অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক। একোনত্রিংশৎ ব্যক্তিকে স্কন্ধোপরি লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া যাদৃশ অসম্ভব, সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে তথায় আমাদিগের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া থাকা তেমনি অসাধ্য হইয়া উঠে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯,৫০,০০০০০ নয় কোটি পঞ্চাশৎ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। উহার আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, পৃথিবীর ন্যায় উহারও উভয় পার্শ্ব কিঞ্চিৎ চাপা। দূরবীক্ষণ-সহকারে দৃষ্টি করিলে সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি কৃষ্ণ-বর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সূর্য্যের কলঙ্ক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডল যেরূপ বায়ুরাশিত পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ একপ্রকার অত্যুষ্ণ প্রদীপ্ত বাষ্পীয় পরিবেশে পরিবৃত। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ ঐ পরিবেশের কিয়দংশ নিরাকৃত হওয়াতে তন্মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল প্রদেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ

চিহ্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এই সকল চিহ্নগুলি সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না। একবার যে চিহ্নটীকে একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিট অতীত না হইলে আবার তাহারে সে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহাতেই বোধ হয়, পৃথিবী যেরূপ স্বীয় মেরু-দণ্ডের উপর ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যও সেইরূপ স্বীয় কক্ষোপরি ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিটে আবর্ত্তন করিতেছে। পরন্তু কোন চিহ্নই চিরস্থায়ী নহে; চারি পাঁচ বারের অধিক কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের সংখ্যাও সর্ব্বদা সমান থাকে না। কখন সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না, আবার কখন বা রাশি রাশি কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। কিয়দ্দিবস অতীত হইল, পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, সার্দ্ধ পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদিগের হ্রাস ও আর সার্দ্ধ পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদিগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতি একাদশ বর্ষে সূর্য্যকে একবার কলঙ্কশূন্য ও এক বার কলঙ্কে পরিপূর্ণ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কলঙ্কের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ভূমণ্ডলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। যাহা হউক, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের আধিক্য হইলে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা সাতিশয় বিচলিত হয় এবং মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে ভূরি ভূরি অরোরা নামক বিচিত্র আলোকরাশি উদিত হইয়া নভঃস্থল আলোকিত করে।

ভূমণ্ডলে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই

সকল পদার্থের যোগেই সূর্য্যমণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে। লৌহাদি কতিপয় ধাতু যে সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্যমান আছে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্য নিজে তেজোময় নহে; একপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পীয় পরিবেশে পরিবৃত থাকাতে ঐরূপ তেজোময় বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু বাষ্পীয় পদার্থ সকল সাতিশয় উত্তপ্ত হইলেও তাদৃশ প্রভা-শালী হয় না; এই নিমিত্ত কোন কোন পদার্থবিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, বাষ্পীয় পরিবেশের অভ্যন্তরস্থ তেজোময় কঠিন অথবা দ্রব পদার্থ হইতেই শুভ্র ও প্রখর জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া চতুঃপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হয়।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে তেজ প্রাপ্ত হয় তদপেক্ষা অন্যূন ২৩০,০০,০০০ গুণ অধিক তেজ উহা হইতে নিয়ত চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তথাপি উহার অপরিমেয় তেজোরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, রাশি রাশি উল্কা অনবরত সূর্য্যোপরি বর্ষিত হইয়া অগ্নি উৎ-পাদন করাতেই সৌরতেজের হ্রাস হয় না। এক জন ইংলণ্ড-দেশীয় পণ্ডিত বলেন, উল্কাবর্ষণবশতঃই সৌরতেজের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে আর উল্কাপাত হয় না; সূর্য্য মণ্ডল এক্ষণে শীতল হইতেছে। জর্ম্মনদেশীয় কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, সূর্য্যমণ্ডল প্রথমে প্রতপ্ত বাষ্পময় পিণ্ড ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হইতেছে। তিনি গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, ১৭০,০০,০০০ বর্ষ এইরূপে তেজ বিকীর্ণ করিলে পর সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন পৃথিবীর ন্যায় হইবে।

এই সৌর জগতে যে সমস্ত তেজোময় বস্তু আছে, তন্মধ্যে

সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। তাঁহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি; কিন্তু তিনি যে কোথা হইতে তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চয় অবগত নহি। তাপ, আলোক ও গতি বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে তিনিই প্রকাশমান হইতেছেন। দাবাগ্নি বৈদ্যুতাগ্নি ও বজ্রাগ্নিতে তিনিই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্রজলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নবপল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিয়া পুনরায় কুঠার দ্বারা তাহাকে ছেদন করিতেছেন। তিনিই হয়াকারে আশুগতি গমন করিতেছেন, তিনিই বিহঙ্গাকারে আকাশমার্গে উড্ডীন হইতেছেন, তিনিই মীনরূপে জলমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। তিনিই বীজ বপন করিতেছেন, তিনিই শস্য আহরণ করিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে আহার দিতেছেন। তিনিই তূলা রোপণ করিতেছেন, তিনিই সূত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তিনিই খনি হইতে অপরিষ্কৃত লৌহ তুলিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিতেছেন, তিনিই রেল নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই জলকে সন্তপ্ত করিয়া বাষ্প করিতেছেন, তিনিই বাষ্পীয় শকটকে বায়ু বেগে লইয়া যাইতেছেন। তিনি তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন,

এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্দ্ধানের অন্তর্গত কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। পাঠকগণ! এ সকল কবিকপোলকল্পিত অলীক কথা নহে; পরন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্রসম্মত যুক্তিসিদ্ধ বাক্য, ইহাতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা সংশয়ের বিষয় নাই।

সম্পূর্ণ

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী